

# বিষের ছোবল

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত



প্রিয়া বুক হাউস

১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

Besher Chhobol  
Written By  
Himadrikishore Dasgupta  
₹ : 150.00

প্রথম প্রকাশ : শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, ১৪২২

প্রকাশক  
দুলাল চন্দ্র সিংহ  
৭৭/৯, রাই মোহন ব্যানার্জি রোড  
কলকাতা-৭০০১০৮  
মোবাইল : ৯৪৩৩৩২৪৪৬৩ / ৯০৩৮১৪৯৬১০  
E-Mail : priyabookhouse@gmail.com  
Website : www.priyabookhouse.org

অক্ষর বিন্যাস  
পুষ্প কম্পিউটার প্রেস  
বালী, ঘোষপাড়া, হাওড়া

মুদ্রক  
এন. বসাক অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস  
৯এ, রামধন মিত্র লেন, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ  
নির্মলেন্দু মণ্ডল

ISBN : 978-93-81827-54-3

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

বৈশালী দাশগুপ্ত-কে

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্য বই :  
বুনবুন প্রাসাদের ছায়া মূর্তি



## প্রথম আখ্যান

সকাল থেকেই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। সাবধানেই খানাখন্দ বাঁচিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল কিটি। মেঠো রাস্তার দু-পাশে ধানের খেত বর্ষার জলে টইটম্বুর। সদ্য রোয়া ধানের চারাগুলো শুধু কিছুটা জেগে আছে জলের ওপর। কখনো আবার রাস্তার পাশে ছোটো-বড়ো জলা। কাচ নামালেই বাইরে থেকে ভেসে আসছে ব্যাঙের কলতান।

টিনা বলল, আর কত দূর রে বাবা! লোকগুলো তো বলল, কিছুটা পথ গেলেই বাড়িটা পেয়ে যাবেন। চারপাশে তো কোনো ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে না!

উইন্ড স্ক্রিনে চোখ রেখে কিটি বলল, ওই দেখ একদল বাচ্চা ছেলে সামনেই যাচ্ছে। ওদের জিজ্ঞেস করব। কিটিরা যে পথে যাচ্ছে সে-পথ ধরেই এগোচ্ছে ছেলেগুলো। কিটিদের গাড়ি পৌঁছে গেল তাদের কাছে। এবার তারা খেয়াল করল ছেলেগুলোর দঙ্গলের ভিতর একটা লোকও আছে। তাকে ঘিরে হল্পা করতে করতে যাচ্ছে ছেলেগুলো। গাড়ির কাচটা নামাতেই কিটিদের কানে এল তাদের অদ্ভুত চিৎকার—ব্যাংবাবু! ব্যাংবাবু!

যার উদ্দেশ্যে এই চিৎকার, ছাতা মাথায় দেওয়া লোকটা একবার পিছন ফিরে তার হাতের লাঠি উঁচিয়ে ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলল, যা ভাগ ভাগ! যত সব শুয়োরের পাল! ছেলেগুলো তার গালাগাল শুনে মজা পেয়ে দ্বিগুণ জোরে চৈচাতে লাগল, ব্যাংবাবু! ব্যাংবাবু!

কিটিরা বুঝতে পারল ছেলেগুলো লোকটার পিছনে লেগেছে। কিটি গাড়ি থামিয়ে হর্ন বাজাতেই ছেলেগুলো গাড়িটাকে দেখেই প্রথমে থমকে গেল। তারপর রাস্তার পাশে জলকাদা ভরা খেতে নেমে ছুটতে শুরু করল এদিক-ওদিক। কিটির সবুজ জিপসি গাড়িটাকে সম্ভবত তারা পুলিশের জিপ ভেবেছে। গাড়ির সামনে রাস্তার ঠিক মাঝখানে শুধু দাঁড়িয়ে রইল সেই লোকটা। মাঝবয়সি একজন লোক। পরনে একটা খাকি শার্ট আর হাঁটুর ওপর তোলা ধুতি, পায়ে কাদামাখা কেডস। লোকটার এক হাতে চটের ব্যাগ আর অন্য

হাতে, যেটা শুধু লাঠি বলে মনে হচ্ছিল, তার মাথায় ছোটো জাল লাগানো। সম্ভবত লোকটা জলকাদার মাঠে মাছ ধরতে বেরিয়েছে। ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে খুব কায়দা করে ছাতাটা নিজের মাথায় ধরে রেখেছে সে। বিস্মিত চোখে সেও তাকিয়ে আছে কিটিদের গাড়িটার দিকে। টিনা বাইরে গলা বাড়িয়ে লোকটার উদ্দেশ্যে বলল, ও দাদা, একটু শুনবেন?

লোকটা ডাক শুনে এক হাতে ব্যাগ আর জাল নিয়ে, অন্য হাতে ছাতাটাকে একটু তুলে ধরে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। টিনা তাকে জিজ্ঞেস করল, দাদা, এখানে স্নেক ফার্মটা কোথায় বলতে পারেন?

লোকটা তাদের কথার জবাব না দিয়ে তাকিয়ে রইল গাড়ির ভিতর বসা শার্ট-প্যান্ট পরা দিদিমণিদের দিকে। লোকটা বুঝতে পারেনি ভেবে টিনা তাকে বলল, ‘স্নেক ফার্ম’ মানে এই যে, এখানে যে বাড়িতে সাপ পোষা হয়?

লোকটার ঠোঁটের কোণে এবার আবছা হাসি ফুটে উঠল। সে প্রথমে বলল, স্নেক ফার্ম তো? ওটুকু ইংরেজি শব্দের অর্থ আমি জানি। ওই যে দূরে রাস্তার বাঁকে গাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন, ওর আড়ালেই বাড়িটা। কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছেন আপনারা। গেলেই দেখতে পাবেন।

টিনা উত্তর শুনে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ দাদা।

কিটি গিয়ার চেঞ্জ করে গাড়িটা এরপর এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় লোকটা একটু ইতস্তত করে বলে উঠল, আপনাদের অসুবিধা না থাকলে আমাকে ওই পর্যন্ত নেবেন, আমি ওখানেই যাব।

কিটি বলল, হ্যাঁ, উঠে পড়ুন।

ছাতা বন্ধ করল লোকটা। গাড়িতে ওঠার সময় লোকটার হাতের ব্যাগটা যেন বার কয়েক কেঁপে উঠল। লোকটা গাড়ির পিছনের সিটে বসার পর অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিয়ে কিটি তার উদ্দেশ্যে বলল, আপনি মাছ ধরতে বেরিয়েছিলেন? আপনার হাতের ব্যাগটা কাঁপছে দেখছি। কী মাছ ধরলেন, শোল?

লোকটা প্রশ্ন শুনে বলল, আপনার তো বেশ নজর! তবে মাছ নয়, ব্যাং ধরতে বেরিয়েছিলাম আমি।

ব্যাং ধরতে! বিস্মিতভাবে বলে উঠল টিনা।

লোকটা বলল, হ্যাঁ, ব্যাং ধরতে। আমি ব্যাং ধরি।

কিটিরা এবার বুঝতে পারল কেন ছেলেগুলো তাকে ‘ব্যাংবাবু! ব্যাংবাবু’ বলে খেপাচ্ছিল।

কিটি বলল, ব্যাং ধরে কী করেন? স্কুল-কলেজের ল্যাবরেটরিতে সাপ্লাই দেন নিশ্চয়ই?

লোকটা জবাব দিল, হ্যাঁ, তা দেই বটে। তবে আসলে আমি ‘সাপের বাসা’র জন্য ব্যাং ধরি।

সাপের বাসা?

লোকটা মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, সাপের বাসা। আপনারা যে বাড়িতে যাচ্ছেন, সে-বাড়িটাকে এখানকার লোকেরা ‘সাপের বাসা’ বলেই ডাকে। ফার্মে প্রায় শ-তিনেক সাপ আছে। তাদের জন্য খাবার সংগ্রহ করতে হয় আমাকে। বর্ষাকালে ব্যাং ধরে রাখি। সারা বছর খাবারের ব্যবস্থা হয় সাপগুলোর।

এরপর লোকটা নিজে থেকেই তার পরিচয় দিয়ে বলল, আমার নাম নীলকণ্ঠ পালিত। ওই ফার্ম হাউসের ওখানেই থাকি। তা আপনারা নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে আসছেন, সাপ দেখতে?

কিটি জবাব দিল, হ্যাঁ।

এটুকু কথা বলতে বলতেই সে জায়গাটার কাছে চলে এল। রাস্তার পাশেই গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল অনেক বড়ো একটা পুরোনো দোতলা বাড়ি। উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা বিরাট বড়ো কম্পাউন্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় খণ্ডহর একলা বাড়িটা। কম্পাউন্ডের বাইরে মেইন গেটের ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল কিটিদের গাড়ি। নীলকণ্ঠ পালিত ওরফে ব্যাংবাবু গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে সেনারা কিটিদের উদ্দেশে বললেন, আমি এখন ভিতরে ঢুকব না। আপনারা ভিতরে যান। সঞ্জীবন ভিতরেই আছে। আমি চললাম। এই বলে ছাতা খুলে প্রাচীরের গা ঘেঁষে অন্যদিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

গেটের বাইরে দেওয়ালের গায়ে একটা সাইনবোর্ড আটকানো আছে। তাতে ইংরেজিতে লেখা, ‘সঞ্জীবনী স্নেক ফার্ম।’ সেদিকে তাকিয়ে কিটি একবার বিড়বিড় করে বলল, ‘সাপের বাসা।’ স্নেক ফার্ম শব্দটার চেয়ে ‘সাপের বাসা’ শব্দটাই বেশি মনে ধরেছে তার।

কিটি হর্ন বাজাতেই গেটকিপার দরজা খুলে দিল। বাড়ির বাঁ-দিকের অংশটা ভেঙে পড়েছে। তবে ডান দিকের অংশটাতে সম্ভবত মানুষজন থাকে। সাদা রঙের প্রলেপ সে-অংশে। যদিও সে-রংও সম্ভবত অনেকদিন আগেই করা হয়েছে। কম্পাউন্ডের ভিতরটা বেশ অপরিচ্ছন্ন। বর্ষার জলে ঝোপ-জঙ্গল

গজিয়েছে। গেটকিপারকে মনে হয় কিটিদের আসার কথা আগেই বলা ছিল। গেট খুলে সেলাম ঠুকে লোকটা কিটিদের আঙুল তুলে বাড়িটার সাদা অংশটা দেখিয়ে দিল। সুরকি বিছানো একটা পথ এগিয়েছে সেদিকে। কিটিরা গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে বাড়িটার সেই অংশের সামনে যেতেই দেখতে পেল সঞ্জীবন সান্যালকে। তাঁর পরনে ধূসর রঙের সাফারি। চোখে সোনালি ফ্রেমের বাইফোকাল। সামনাসামনি তাঁকে কোনোদিন না দেখলেও ল্যাপটপে তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলের ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে কিটি। তাই তাঁকে তার চিনতে অসুবিধা হল না। জিপসি থেকে নামার আগে ঘড়ি দেখল টিনা। বেলা এগারোটো বাজে। কলকাতা থেকে এখানে আসতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগল তাদের।

জিপসি থেকে নামল তারা। সঞ্জীবন একবার ভালো করে দেখলেন কিটিদের। একটা অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠল মাঝবয়সি সঞ্জীবনের ঠোঁটের কোণে। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন, আপনাদের আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

কিটি জবাব দিল, না অসুবিধা হয়নি। বর্ষায় রাস্তাটা একটু খারাপ, এই যা!

সঞ্জীবন বললেন, আসুন, ভিতরে আসুন। আপনাদের ব্যাগেজ আমার লোক নামিয়ে দেবে।

বাড়ির ভিতর ঢোকান সময় কিটি বলল, আপনাদের বাড়িটা তো অনেক পুরোনো মনে হচ্ছে। জমিদার বাড়ি-টাড়ি ছিল নাকি?

একটা প্রায় অন্ধকার সঁাৎসেঁতে লম্বা অলিন্দ ধরে বাড়ির ভিতর ঢুকতে ঢুকতে সঞ্জীবন বললেন, না, জমিদার বাড়ি নয়। এক নীলকর সাহেবের বাড়ি ছিল। একসময় এ অঞ্চলে নীলের চাষ হত। আশপাশের গ্রামে এখনও নীল ভেজাবার চৌবাচ্চা দেখা যায়। এজন্যই তো জায়গার নাম নীলগঞ্জ। আমি এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এই বাড়িটা কিনেছি।

টিনা চাপা স্বরে কিটিকে বলল, একদম ভূতুড়ে বাড়ির মতো!

সে কথাটা আস্তে আস্তে বললেও তা কানে গেল সঞ্জীবনের। তিনি বললেন, হ্যাঁ ভূতুড়েই বলা যায়। বাড়ির এদিকের অংশ আর দোতলার কিছু অংশ মেরামত করে আমরা আছি। তবে আমার কাজের পক্ষে এ জায়গাটা আদর্শ। লোকালয়ের মধ্যে কেউ সাপ নিয়ে বসবাস করতে দিত না। সাপ সম্বন্ধে

মানুষের স্বাভাবিক ভীতি আছে। অথচ সাপ এমনিতে নিরীহ প্রাণী। তারাই বরং মানুষকে ভয় পায়...

কথা বলতে বলতে সঞ্জীবন কিটিদের নিয়ে প্রবেশ করলেন বেশ বড়ো একটা ঘরের মধ্যে। এ ঘরটাতে বাইরে থেকে জানলা দিয়ে বেশ আলো আসছে, আর বাড়ির পিছন দিকটাও দেখা যাচ্ছে। পিছনে কোনো প্রাচীর নেই। বেশ কয়েক বিঘা জমি, আর তার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বড়োসড়ো গাছ। একটা ছোটো বাড়িও যেন দেখা যাচ্ছে সেদিকে।

এ ঘরটা সম্ভবত সঞ্জীবন সান্যালের কাজের ঘর। কাচ বসানো একটা টেবিলকে ঘিরে রাখা আছে বেশ কিছু চেয়ার। টেবিলের একপাশে ফাইলের জুপ। একপাশে দেওয়ালের গায়ে সারবাঁধা কিছু ফটোগ্রাফ। তাতে সাপের সঙ্গে সঞ্জীবনবাবুর ছবি। গোটা চারেক কাগজপত্র ঠাসা আলমারিও রয়েছে ঘরে। এক কোণে একটা কাঠের র্যাকে শোয়ানো আছে নানা আকারের বেশ কয়েকটা স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম স্টিক। তার মাথার দিকটা ছকের মতো বাঁকানো। কিটি ছবিতে দেখেছে ওই স্টিকগুলো। ওগুলো দিয়ে সাপ ধরা হয়। কিন্তু ঘরের চারপাশে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে যে জায়গাতে তাদের চোখ আটকে গেল সেখানে মাটিতে রাখা আছে বিরাট একটা খাঁচা। মাটি থেকে অন্তত ফুট পাঁচেক লম্বা আর সেই অনুপাতে চওড়া খাঁচাটার মধ্যে একটা মোটা গাছে জড়িয়ে আছে বিরাট বড়ো একটা সাপ।

সেটার দিকে কিটিদের চোখ পড়তেই নিজের চেয়ারে বসতে বসতে সঞ্জীবন হেসে বললেন, ওর নাম দিয়েছি ‘বাসুকি’। পাইথনের বাচ্চা। তোসাঁর পার থেকে ধরেছিলাম ওকে। ওর তো বিষ নেই, তাই আমার ব্যবসার কাজে লাগে না। ওকে শখ করে পুষছি আমি।

টেবিলের অন্যপাশে সঞ্জীবনের মুখোমুখি বসল কিটিরা। কয়েক মুহূর্ত তাদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সঞ্জীবন বললেন, আপনাদের ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির বিজ্ঞাপন আমি খবরের কাগজে দেখেছি। আরও কয়েকটা গোয়েন্দা সংস্থার বিজ্ঞাপনও দেখেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনাদেরই ডাকলাম।

কিটি মৃদু হাসল তাঁর কথা শুনে।

ভদ্রলোক এরপর বললেন, আপনাদের চূজ করার পিছনে একটা বিশেষ কারণ আছে। আমি জানি বাস্তবে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের কাজের পরিসর খুব সীমিত। গল্পের বইয়ের শার্লক হোমস, পোয়ারো, ব্যোমকেশ বা ফেলুদারা যেমনভাবে অপরাধী পাকড়ান বা ফ্রেবিশেষে তাদের বিচার করেন, বাস্তবের প্রাইভেট ডিটেকটিভদের আইন সেক্ষমতা দেয়নি। এমনকী আপনাদের বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে আদালতগ্রাহ্য নয়। আপনারা শুধু ক্লায়েন্টের পছন্দমতো ইনভেস্টিগেশন করতে পারেন, আর ক্লায়েন্টের প্রশ্নের উত্তর তাঁকে জানাতে পারেন। আমি আপনাদের চূজ করেছি আপনারা মহিলা বলে...।

মহিলা বলে মানে? তাঁর কথার মাঝেই একটু বিস্মিতভাবে বলে উঠল টিনা।

তিনি হেসে বললেন, অন্য কিছু ভাববেন না ম্যাডাম। আমি মহিলাদের রেসপেক্ট করি, তাদের কর্মক্ষমতায় আস্থা রাখি। মহিলারা এখন দেশ চালাচ্ছেন, মহাকাশে যাচ্ছেন, অনেক কাজ পুরুষদের থেকেও সফলভাবে করছেন, কিন্তু মহিলা ডিটেকটিভ এখনও তেমনভাবে দেখা যায় না। তাই আপনারা এ বাড়িতে থাকলে বা যাওয়া-আসা করলে লোকে আর যাই ভাবুক, অন্তত গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করবে না। তাই...

কিটি বলল, বুঝলাম। এবার সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক। আপনি টেলিফোনে বলেছিলেন আপনি বিপদের আশঙ্কা করছেন! কী বিপদ? কীসের বিপদ, সব কিছু খুলে বলুন। কোনো কথা বাদ দেবেন না অপ্রয়োজনীয় বলে। আমি সব কিছু পরিষ্কারভাবে জানতে চাই।

কিটির কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন সঞ্জীবন। তারপর বললেন, আমার ধারণা আমাকে খুনের চেষ্টা করা হচ্ছে। ওই বাসুকিই আমাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েছিল।

ব্যাপারটা খুলেই বলি। তিনদিন আগে আমি কলকাতা গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে। দুপুরে বেরিয়েছিলাম, ফিরলাম রাত আটটা নাগাদ। ফিরে এ ঘরে ঢুকলাম কাগজপত্র রাখার জন্য। সঙ্গে স্ট্যাম্প-প্যাডও আছে, সেগুলো আমি এই টেবিলের ড্রয়ারেই রাখি। যদিও সেদিনের আগে ড্রয়ারে তালা দেওয়া থাকত না। যাইহোক, অফিস ব্যাগটা এই টেবিলে রেখে কাগজ, স্ট্যাম্প-প্যাড ইত্যাদি বার করার আগে বাসুকির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, ওকে বেশ ক-দিন খাঁচার বাইরে বার করা হয়নি। ওর অত বড়ো শরীর তো খাঁচার মধ্যে মেলতে পারে না। ওর সুস্থতার জন্যই মাঝেমাঝেই ওকে খাঁচার বাইরে আনি যাতে ও শরীরটা ছড়াতে পারে। ঘোরাঘুরি করতে পারে ঘরের মধ্যে। সাধারণত ওকে বাইরে এনে প্রথমে এই টেবিলে রাখি, তারপর ও নিজেই বুক বেয়ে মেঝেতে নেমে যায়। সেদিনও ওকে খাঁচা থেকে বার করে এই টেবিলের ওপর রাখলাম। ও খুব শান্ত প্রাণী। খুব ধীরে চলাফেরা করে। কিন্তু সেদিন ওকে টেবিলে রাখার সঙ্গেসঙ্গেই ও কেমন অদ্ভুতভাবে ছটফট করতে লাগল, আর উত্তেজিতভাবে জিভ বার করতে লাগল। রেগে গেলে ও এমন করে। কিন্তু হঠাৎ কেন রেগে গেল? কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার থার্ড সেন্স কাজ করল। সাপ নিয়ে কাজ করি তো তাই এই সেন্সটা আমাদের একটু সজাগ হয়। আমার খেয়াল হল, বিজাতীয় কোনো সাপ দেখলে বাসুকি এমন রেগে যায়। আমার সঙ্গেসঙ্গে মনে হল, এ ঘরে কোনো সাপ নেই তো? কোনো সাপ হয়তো পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে এ ঘরে। দু-একবার এ ঘটনা ঘটেছে। সাপ পালিয়ে এসে ঢুকেছিল অন্য ঘরে। আমি দেখার চেষ্টা করলাম কোথাও সাপ আছে কি না। বাসুকির আচরণ দেখে মনে হচ্ছে খুব কাছেই আছে সাপটা। আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার উপস্থিতি আমি ধরতে পারলাম একটা তীব্র হিস হিস শব্দ শুনে। আর শব্দটা আসছিল এই আমি যেখানে বসে আছি তার সামনের এই ড্রয়ার থেকে।

ব্যাপারটা বোঝার সঙ্গেসঙ্গে আমি বাসুকিকে খাঁচায় পুরে স্টিক নিয়ে এসে দেরাজটা খুললাম। আর সঙ্গেসঙ্গে ফণা তুলে লাফিয়ে উঠল সে! একটা স্যান্ড ভাইপার। কিছুদিন আগে আমি ইরান থেকে একটা সাপ আনিয়েছি, ওটা সেটাই। ছোবল মানেই নির্ঘাত মৃত্যুর পরোয়ানা!...

কিন্তু আপনার তো অ্যান্টিভেনাম থাকে নিশ্চয়ই? তাহলে ও ছোবল দিলে

আপনার তো প্রাণনাশ হত না? তার কথার মধ্যেই প্রশ্ন করল কিটি।

সঞ্জীবন বললেন, হ্যাঁ সাপের বিষ, অ্যান্টিভেনাম, এসব নিয়েই আমার কারবার। কিন্তু এক এক সাপের বিষে জৈব রসায়নের কম্পোজিশন এক একরকম হয়। এর অ্যান্টিডোজ এখনও আবিষ্কার হয়নি। ওর ছোবল মানেই অবধারিত মৃত্যু। ওর বিষ নিয়ে গবেষণা করার জন্যই কেনা হয়েছে ওকে। বাসুকি যদি আমাকে সতর্ক না করত তাহলে স্ট্যাম্প-প্যাড বা কাগজপত্র রাখার জন্য আমি ড্রয়ার খুলে ভিতরে হাত ঢোকালেই ও নির্ঘাত ছোবল মারত আমাকে। লোকে ভাবত এটা একটা অ্যান্টিডেন্ট, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাপটাকে কেউ এই ড্রয়ারে এনে ঢুকিয়েছিল। সেই 'সাপটাকে, আপনাদের মাধ্যমে আমার জানা দরকার। সে হয়তো আবার অন্যভাবে আমাকে অ্যাটেম্পট করতে পারে। সাপের ঘরের চাবিটাও তো আমার কাছেই ছিল। ঘরটাই বা খুলল কীভাবে কে জানে?

কিটি জানতে চাইল, এমনও তো হতে পারে, সাপটাকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে সে বেরিয়ে আপনার ড্রয়ারের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। সাপ তো সাধারণত অন্ধকার, ঠান্ডা জায়গা পছন্দ করে বলে শুনেছি।

সঞ্জীবন জবাব দিলেন, হ্যাঁ, সেটা হতে পারত, তবে সেদিন সকালে ভাইপারের বাস্ফটা আমি নিজের হাতে বন্ধ করেছিলাম। আর এই ড্রয়ার আর সাপটাকে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এ ড্রয়ারটা বন্ধ থাকলে সাপ ঢোকার কোনো জায়গা নেই।

কিটি বলল, এমন তো হতে পারে যে ড্রয়ারটা খোলা অবস্থাতেই, অর্থাৎ টানা অবস্থায় আপনি রেখেছিলেন? সাপটা বাস্ফ থেকে বেরিয়ে নিজেই ঢোকে ড্রয়ারে। তারপর বাড়ির কোনো লোক ড্রয়ারটা খোলা দেখে সাপটা না দেখেই ওটা বন্ধ করে দেয়?

সঞ্জীবন বললেন, এমনটা হতে পারে ঠিকই। কিন্তু বাস্ফ আর ড্রয়ার দুটোই কি বন্ধ করতে ভুলে গেলাম! তা ছাড়া, এ বাড়িতে যারা আজকাল থাকে তাদের প্রত্যেককে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে তারা এ ঘরে ঢুকেছিল কি না। শুধু নিরুপম বলেছে, সে একবার এ ঘরে ঢুকেছিল আলমারি থেকে একটা দরকারি কাগজ নেবার জন্য। কিন্তু বাড়ির অন্যরা বলছে তারা কেউ ঢোকেনি এ ঘরে। আর মিস্টার বুধিয়া এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে বেলা



দশটা নাগাদ। কলকাতা থেকে এসেছিলেন। ওঁরও বায়োভেনাম, অ্যান্টিভেনামের কারবার। সাউথ ইন্ডিয়াতে ওরও একটা স্নেক ফার্ম আছে। ও যখন এসেছিল তখন তো আমি ঘরেই ছিলাম। ব্যাবসার ব্যাপারেই এসেছিল ও।

কিটি জিঙ্গেস করল, নিরুপমাটা কে? আপনার বাড়িতে আর কে কে থাকেন?

সঞ্জীবন বললেন, নিরুপম মাইতি। বছর পঁচিশ বয়স হবে ওর। আমার কাজে ও সাহায্য করে। অ্যাসিস্ট্যান্ট বলতে পারেন। এ ছাড়া থাকেন আমার স্ত্রী রুবি, ভাইপো অরিন্দ্র, ওর মা অঞ্জনা, দশরথ দাস আর ওর স্ত্রী মনসা। শেষের দুজন অবশ্য ঠিক এদিকটায় থাকে না। বাড়ির বাঁ-দিকটায় একটা ঘর মেরামত করে দিয়েছি ওদের জন্য। আদিত্যে ওরা ওড়িশার লোক। সাপুড়ে সম্প্রদায়ের লোক। ওড়িশার দাস পদবির ওই সাপুড়ে সম্প্রদায়ের বেশ খ্যাতি আছে বিষাক্ত সাপ ধরার জন্য। বিশেষত ওরা খুব ভালো শঙ্খচূড় ধরতে পারে। আমার কাজের সুবিধার জন্যই দশরথকে এখানে এনে রেখেছি। ওর স্ত্রী এ বাড়িতে ঘরদোর মোছে, ফাইফরমাশ খাটে। ও হ্যাঁ, ওই নেপালি গেটম্যানটাকে আমি গতকালই কাজে বহাল করেছি।

বাইরের লোক কে কে এ বাড়িতে নিয়মিত আসেন? নিজের বুদ্ধিমত্তা কিটির কাছে তুলে ধরার জন্যই গম্ভীরভাবে সঞ্জীবনকে এবার প্রশ্ন করল টিনা।

সঞ্জীবন জবাব দিলেন, হ্যাঁ কিছু লোক আসেন ব্যাবসার কাজে। তবে তাঁরা নিয়মিত নন। নিয়মিত বলতে আসেন দুজন। একজন নীলকণ্ঠ পালিত। ও আমাকে ব্যাং সাপ্লাই দেয় আর মাঝেমধ্যে ওকে ব্যাবসার কাজে কলকাতায় পাঠাই। আর অন্যজন বোগাস লোক, মাথাটা একটু খারাপ। বুড়ো মানুষ। তার দৃঢ় বিশ্বাস এ বাড়িতে ইংরেজ আমলের ধনরত্ন লুকানো আছে। তাও আবার সেটা যে সে রত্ন নয়, সাপের মাথার মণি। কাশীনাথ চক্রবর্তী নাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাড়ির ভাঙা অংশটাতে সাপের মাথার মণির খোঁজে ঘুরে বেড়ান। বুড়ো মানুষ তাই বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করতে পারি না। ওর ধারণা মণিটা সমেত সাপটাকে আমি লুকিয়ে রেখেছি। আমার ওপর লোকটা খাপ্পা ঠিকই কিন্তু স্যান্ড ভাইপার ধরে ঘরে ঢোকানো ওর কর্ম নয়। কিটি এবার জানতে চাইল, আচ্ছা, এ বাড়িতে কে কে সাপ ধরতে পারে। মানে হ্যান্ডলিফ করতে পারে?

সঞ্জীবন তাঁর চশমাটা নাকের ডগা থেকে তুলে বললেন, দেখুন এ ব্যাপারটা বাড়ির সবাই-ই কম-বেশি পারেন একমাত্র অঞ্জনা ছাড়া। আমার স্ত্রী আর অরিত্র অবশ্য সাপ খুব একটা ভালোবাসে না। বিষধর সাপ নিয়ে সাধারণত আমি আর দশরথই হ্যান্ডলিফ করি। আচ্ছা, আপনারা তো এ বাড়ির সবার সঙ্গে কথা বলবেন? নিজেদের পরিচয় আপনারা কী দেবেন?

কিটি বলল, হুঁ। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ইন্টারভিউ নিলে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। দু-দিন আমরা থাকব এখানে। নিশ্চয়ই তার মধ্যে আমাদের সবার সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ হবে? আপনি বলবেন আমরা খবরের কাগজ, ম্যাগাজিনে ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিকতা করি। সাপ নিয়ে একটা ফিচার লেখার জন্য আমরা এখানে দু-দিন থেকে আপনার কাজ দেখব।

সঞ্জীবন হেসে বললেন, আমিও এ-রকম কিছু একটা ভাবছিলাম। এর আগে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকজন সত্যি সাংবাদিক এসেছিলেন সাপের ছবি-টবি তুলতে। এক ভদ্রলোক দু-দিন থেকেও গিয়েছিলেন। কাগজে আমার ছবিও উঠেছিল।

কিটি হেসে বলল, ভেরি গুড! আচ্ছা, আপনার অনুমান যদি সত্যি হয় তবে কাজটা কে করতে পারে বলে আপনার সন্দেহ হচ্ছে? বিশেষ কেউ?

কিটির কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সঞ্জীবন খোলা জানালার বাইরে বর্ষাসিক্ত মাঠের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, সন্দেহ করলে তো এক অর্থে সবাইকে করতে হয়। মানুষের মন বড়ো জটিল, তার তল পাওয়া মুশকিল! আপনাদের আর কিছু প্রশ্ন আছে? বাই দ্য ওয়ে, দোতলায় একটা ঘরে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকটা পথ এসেছেন, রেস্ট করে খাওয়াদাওয়া সেরে নিন। তিনটে নাগাদ আমি আপনাদের সাপের ঘরে নিয়ে যাব।

কিটি জবাব দিল, না, এই মুহূর্তে আর কিছু জানার নেই, প্রয়োজন হলে জেনে নেব। তবে ড্রয়ারটা এখন একবার আমি দেখব। আপত্তি নেই তো?

‘না, না, আপত্তির কী আছে?’ সঞ্জীবন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে চাবি বের করে ড্রয়ারটা খুললেন। কিটিরা টেবিলের ওপাশে ড্রয়ারটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ বড়ো খোপ। সামান্য কিছু কাগজপত্র থাকলেও মোটামুটি ফাঁকাই। কিটি বেশ কয়েকবার ড্রয়ার খোলা-বন্ধ করে, ওপর থেকে, পাশ থেকে টেবিলের নীচে ঢুকে ভালো করে দেখল সেটা। বন্ধ অবস্থায়

কোনো কিছুই ড্রয়ারে ঢুকতে পারে বলে মনে হল না কিটিদের। তাদের দেখা শেষ হলে সঞ্জীবন ড্রয়ার বন্ধ করে ঘর ছেড়ে বেরোলেন।

তাঁর পিছন পিছন পুরোনো দিনের একটা চওড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কিটিরা ওপরে উঠে এল। ওপরে দু-দিকে চওড়া বারান্দা চলে গেছে। তার দু-পাশে সার সার ঘর। মাথার ওপর কড়িবরগার ছাদ। বারান্দার একদিকে এগোতে এগোতে কিটি জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি সব ওপরেই থাকেন?। সঞ্জীবন বললেন, হ্যাঁ। আমি আর আমার স্ত্রী এদিকের বারান্দার ঘরে, আর অরিত্রা থাকে ওপাশের বারান্দার ঘর নিয়ে।

কিটিদের নিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা ঘরে ঢুকলেন সঞ্জীবন। বেশ বড়ো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। খাট-আলমারি সবই আছে। অ্যাটাচড বাথ। খোলা জানালা দিয়ে বাড়ির পিছনের ফাঁকা জমিটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। বর্ষাসিক্ত মাঠে জল জমে আছে। সঞ্জীবন বললেন, এ ঘরে একটাই অসুবিধা হবে আপনাদের ইলেকট্রিসিটি নেই বলে সোলার সিস্টেমের ব্যবস্থা এখানে। ক-দিন ধরে তো সূর্যের দেখা নেই। বাতির তেমন জোর থাকবে না।

কিটিদের ব্যাগেজ এর মধ্যেই কে যেন ঘরে এনে রেখেছে। সামান্য টুকটাকি কথা বলে এরপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সঞ্জীবন।

তিনি চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে সাদা বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়ে টিনা। কিটিকে জিজ্ঞেস করল, সঞ্জীবনবাবুর সঙ্গে কথা বলে কী বুঝলি?

কিটি ব্যাগ থেকে তার ল্যাপটপ বার করতে করতে জবাব দিল, ওর কথা শুনে বুঝলাম যে উনি নিজের স্ত্রীকেও সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখতে চান না। কারণ তিনি আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন, সবাইকে সন্দেহ করেন। মানবমন বড়ো জটিল। নিজের স্ত্রীকেও তার সন্দেহ করার কী কারণ? ল্যাপটপ নিয়ে এরপর খাটে বসে গেল কিটি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজায় টোকা দেবার শব্দ শুনে দরজা খুলেই কিটি দেখতে পেল খাবারের ট্রে নিয়ে একটা বউ এসে দাঁড়িয়েছে। বছর পঁচিশ বয়স হবে তার। গায়ের রংটা ময়লা হলেও একটা আলগা চটক আছে। নাক-মুখও বেশ সুন্দর। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেশ।

ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ট্রেগুলো নামিয়ে রেখে সে কিটির উদ্দেশে বলল, দিদিমণি তোমাদের খাবার। খেয়ে নাও।

ধোঁয়া উঠছে গরম ভাত থেকে। মুরগির মাংসেরও গন্ধ লাগছে নাকে। সেই গন্ধ পেয়ে উঠে বসল টিনা। বউটা এবার তাদের উদ্দেশ্যে বলল, তোমরা তো এখানে থাকবে, তাই না? রাত আটটা পর্যন্ত আমি ওপরেই থাকি। কোনো দরকার হলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ‘মনসা’ বলে হাঁক দিয়ো, আমি চলে আসব।

এই তাহলে দশরথের বউ মনসা! কিটি ভালো করে তাকাল তার দিকে। ছাপা শাড়ির আড়াল থেকে তার ভরস্তু যৌবন যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মনসার দিকে তাকাতেই সে এরপর খিলখিল করে হেসে বলল, অমন করে তাকাচ্ছ কেন দিদিমণি? তুমি তো পুরুষমানুষ নও! তার ব্যক্তিত্বের তরলতা ধরা পড়ল তার গলায়। এরপর হঠাৎ তার চোখ গেল খাটের ওপর খোলা ল্যাপটপটার দিকে। মুভি ওয়ালপেপারে পাখির ঝাঁক তখন উড়ে বেড়াচ্ছিল স্ক্রিনে। মনসা তাড়াতাড়ি খাটের সামনে এসে ল্যাপটপটার ওপর ঝুঁকে পড়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলল, এটা কী গো দিদিমণি? সিনেমা হচ্ছে! সিনেমা দেখা যায় এর মধ্যে?

কিটি মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ সিনেমা দেখা যায় ওর মধ্যে।

মনসা বলল, আমাকে একটা সিনেমা দেখাবে? এ বাড়িতে তো টিভি নেই।

কিটি বলল, টিভি না থাকলেও তো সিনেমা হল আছে। তুমি সিনেমা দেখতে যাও না? বর নিয়ে যায় না?

মনসা বিস্মিতভাবে ল্যাপটপটার দিকে চোখ রেখে বলল, বরের কথা আর বোলো না! সারাদিন নেশা করে ঘরে বসে থাকে। বাইরে বেরোয় শুধু সাপ ধরতে। সিনেমা হল সেই বারাসতে! একা একা অতদূর আমি যেতে পারি না। দেখাবে গো একটা সিনেমা?

কিটি হেসে বলল, হ্যাঁ দেখাব। কিন্তু তুমি এখানে আমাদের কী দেখাবে বলো? আমরাও তো এখানে দেখতে এসেছি খবরের কাগজে লিখব বলে।

মনসা তাদের কথা শুনে একটু ভাবল। তারপর বলল, আমি তোমাদের একটা নতুন জিনিস দেখাব।

কী জিনিস?

মনসার ঠোঁটের কোণে একটা হাসি কিলিক দিয়ে উঠল। দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে চাপাস্বরে বলল, শঙ্খলাগা! সাপের শঙ্খলাগা তোমরা দেখেছ দিদিমণি? আমি দেখাব তোমাদের।

কিটি অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে।

মনসা বলল, হ্যাঁ দেখাব। কিন্তু কাউকে বলবে না। ও জিনিস দেখলে কাউকে বলতে নেই। এই বলে মনসা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

## ॥ ৩ ॥

ঠিক তিনটেতে নীচে নামল কিটিরা। সঞ্জীবন তাদের দেখে বললেন, চলুন এবার আপনাদের সাপের ঘর দেখিয়ে আনি।

ক্যামেরা, নোটবুক এসব হাতে নিয়ে তৈরি হয়েই নেমেছে কিটিরা। যাতে কেউ তাদের দেখলে সত্যিই সাংবাদিক বলে ভাবে। কিটি প্রশ্ন করল, আপনার কাছে কতগুলো সাপ আছে?

সঞ্জীবন বললেন, প্রায় আশিটার মতো। বিষ উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে ওদের জঙ্গলে ছেড়ে দিই। নইলে আরও থাকত। যে সাপগুলো খুব দামি, সেগুলোই এখন দেখাব আপনাদের। পরে নয় অন্যগুলো দেখাব। এই বলে কিটিদের নিয়ে সাপের ঘরে যাবার জন্য এগোলেন সঞ্জীবন।

তার পিছনে যেতে যেতে কিটি জানতে চাইল, শুনেছি সাপের বিষের নাকি সাংঘাতিক দাম? আপনার আপত্তি বা ব্যাবসায়িক অসুবিধা না থাকলে এ ব্যাপারে একটু বলবেন?

এগোতে এগোতে সঞ্জীবন হেসে উঠে বললেন, এ ব্যাপারে বলতে আপত্তির কিছু নেই। কারণ এটা এমনই একটা ব্যাবসা যে এ সম্পর্কে জানলেও, পয়সা থাকলেও এ ব্যাবসা কেউ করতে পারবে না। সরকারি আইনকানুনের ব্যাপার আছে, সবচেয়ে বড়ো কথা, সাপ নিয়ে ঘর করা আর সায়নাইডের অ্যাম্পুল গালে নিয়ে ঘোরা একই ব্যাপার। এই রিস্ক কোটিতে একজন নিতে পারে। একটা বিষধর সাপের বিষ প্রতি মিলিগ্রাম বিক্রি হয় ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকায়। পূর্ণবয়স্ক একটা সাপ বছরে ১২ মিলিগ্রাম বিষ জমায়। অন্তত পনেরো দিনের ব্যবধান রাখতে হয় এক মিলিগ্রাম বিষ নেবার জন্য। ফার্মে এক একটা সাপ সাত-আট বছর বিষ সরবরাহ করতে পারে। তাঁর কথা শুনে টিনা চট করে হিসাব করে নিয়ে বলল, তার মানে একটা সাপ থেকে বছরে দেড় লক্ষ টাকার বেশি আয় হতে পারে।

সঞ্জীবন বললেন, হ্যাঁ তেমন সাপ হলে হয়। সাপের বিষ তো সঞ্জীবনী।

শুধু অ্যান্টিভেনাম নয়, ব্যথা কমানোর ওষুধেও এর ব্যবহার আছে। ক্যান্সার প্রতিরোধেও সাপের বিষ নিয়ে বিদেশে গবেষণা চলছে। টিনা বলল, শুনেছি, যারা আফিমখোর বা খুব নেশাভাং করে, তাদের নাকি সাপের বিষে কিছু হয় না? উলটে সাপ কামড়ালে সাপই মারা যায়?

সঞ্জীবন বললেন, একদম বোগাস ব্যাপার। বরং তার উলটোটাই ঘটে। কিন্তু সাপের বিষ স্নায়ুতন্ত্রকে অকেজো করে দেয়। নেশা যারা করে তাদের স্নায়ুতন্ত্র এমনিতেই দুর্বল হয়। তাই সাধারণ মানুষের চেয়ে নেশাখোর মানুষদের সাপে কামড়ালে তাদেরই অর্থাৎ নেশাগ্রস্তদের মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি থাকে। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটা বলি, সাপ বিষ ঢালে, তুলতে পারে না। মানুষের শরীরে বিষ যদি থাকত তা সে নিজের দেহে নিতে পারত না।

এরপর মৃদু রাগত স্বরে তিনি বললেন, কিছু সিনেমার কল্যাণে এসব মিথ্যা প্রচার মানুষের মধ্যে আরও ছড়িয়েছে। এই কুসংস্কার প্রচারে সাতের দশকের এক বাংলা সিনেমা অগ্রগণ্য। সাপ বিষও তুলতে পারে না, দুধও খেতে পারে না। ওদের স্মৃতিশক্তি নেই বললেই চলে, দৃষ্টিশক্তি বেশ কম, তাই লোক চিনে প্রতিশোধ নেওয়া বা বিষ তুলে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু বুজরুক ওঝারা এসব ব্যাপারকেই হাতিয়ার করে। আমাদের দেশের সেন্সর বোর্ড ফিল্মে যৌনতা বা ভায়োলেন্স থাকলে সিনেমার ওপর কাঁচি চালায়, কিন্তু এসব সিনেমাকে কীভাবে ছাড়পত্র দেয় কে জানে! যৌনতা বা ভায়োলেন্সের চেয়ে এসব কুসংস্কার আরও বেশি মারাত্মক!

কথা বলতে বলতে বেশ কয়েকটি ঘর পেরিয়ে সাপের ঘরের সামনে পৌঁছে গেল তারা। দরজার সামনে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কিটিদের বয়সেরই ছেলে হবে সে। পরনে জিন্স-ট্রাউজার, ছিপছিপে গড়ন, স্মার্ট চেহারা। সঞ্জীবন তার উদ্দেশে বললেন, এনারাই কলকাতা থেকে এসেছেন। কাগজের লোক। যাদের কথা তোমাকে বলেছিলাম...

ছেলেটা হাতজোড় করে কিটিদের নমস্কার জানিয়ে বলল, আমি নিরুপম। আসুন আপনারা।

কিটিরাও প্রতিনমস্কার জানাল তাকে।

বাইরের সুইচ বোর্ড থেকে সম্ভবত ঘরের ভিতরের বাতি জ্বালাল নিরুপম। সে দরজা খোলার আগের মুহূর্তে সঞ্জীবন কিটিদের উদ্দেশে বললেন, ভিতরে

টোকার আগে একটা কথা আপনাদের বলি। কোনো অবস্থাতেই ভিতরে ঢুকে ঘাবড়াবেন না, বা চিৎকার করবেন না। নার্ভ ঠিক রাখবেন। সামান্য অসতর্কতার জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। আমি আর নিরুপম দুজনেই আছি। আপনাদের কোনো ভয় নেই...। কিটি তাকিয়ে দেখল সঞ্জীবনবাবুর কথা শুনে টিনার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল! কিটি হেসে জবাব দিল, না, নার্ভ ফেল হবার ব্যাপার নেই।

সঞ্জীবন হেসে বললেন, জানি, তবু বললাম। আসলে সাপ জিনিসটা এমনই যে অনেক সাহসী মানুষও ওকে কাছ থেকে দেখলে ভয় পায়। আসলে দীর্ঘদিন ধরে সাপ সম্পর্কে চলে আসা নানা ধারণা আমাদের মনের অবচেতনে বাসা বেঁধে থাকে।

দরজা খোলা হল। প্রথমে বাইরের দরজা, তারপর তার গায়ে লাগানো ঘন নেটের একটা দরজা। আলো জ্বলছে ঘরে। দু-দিকের দেওয়ালে কাঠের বাস্ক। তাদের গায়ে রাখা আছে নানা আকারের কাঠের বাস্ক। ঘরের অন্য একদিকে কিছু খাঁচাও আছে তার মধ্যে সাপ দেখা যাচ্ছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে বেশ লম্বা একটা নীচু টেবিলও আছে। বেশ একটা ঠান্ডা ভাব ঘরের মধ্যে। দুটো বড়ো জানলা, তার গায়ে নেট লাগানো। সঞ্জীবন জানলা দুটো খুলল। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে মুখ তুলেছে শেষ বেলার ঝলমলে রোদ। জানলা দুটো খুলতেই আলোতে ভরে গেল ঘরটা। দরজার কোনো থেকে একটা স্নেক স্টিক, মাথা বাঁকানো সাপ ধরার লাঠি তুলে নিয়ে সঞ্জীবন কী-একটা ইশারা করলেন। নিরুপম তার কথা শুনে র্যাকের থেকে বেশ বড়ো একটা বাস্ক এনে নীচু টেবিলটার ওপর নামিয়ে রাখল। টেবিলটার থেকে কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে কিটিরা। সঞ্জীবন এরপর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিরুপম এরপর সাবধানে বাস্কের মাথাটা খুলল। তালা নেই বাস্কতে স্লাইডিং সিস্টেম। সঞ্জীবন ঝুঁকে পড়লেন বাস্কর ওপর। তারপর স্নেক স্টিকটা বাস্কর ভিতর ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে টেনে বের করলেন বিরাট বড়ো একটা সাপ। অত্যন্ত সাবধানে সাপটাকে টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি। তিন মিটারেরও বেশি লম্বা হবে সাপটা। মানুষের বাহুর মতো। ধূসর বাদামি দেহের কিছুটা তফাতে তফাতে কেউ যেন সাদা রঙের চুড়ি পরিয়ে রেখেছে। সাপটা নিশ্চলভাবেই টেবিল পড়ে আছে। তার দিকে চোখ রেখে সঞ্জীবন বললেন

এটা হল ‘শঙ্খচূড়’ বা ‘কিং কোবরা’। মারাত্মক বিষধর সাপ। বিষাক্ত সাপের মধ্যে এ সাপই সবচেয়ে বড়ো হয়। সাড়ে পাঁচ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এরা। পশ্চিমঘাট পর্বত, উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি জঙ্গলে এদের বেশি দেখা যায়। আন্দামানের জঙ্গলেও এদের পাওয়া যায়। বেশ বুদ্ধিমান সাপ। গতকালই একটা মুরগি দেওয়া হয়েছিল ওকে। পেটটা ফোলা আছে খেয়াল করুন। খাদ্য গ্রহণের পর বেশ কয়েকদিন ওরা কিমিয়ে থাকে। দেখি ওকে জাগানো যায় কি না। একথা বলেই সঞ্জীবন স্নেক স্টিকটা সাপটার মুখের ঠিক সামনে নাড়াতে লাগল। সাপটা কিছুক্ষণ পর যেন একটু কঁপে উঠল, আর তারপরই মুহূর্তের মধ্যে প্রায় দু-হাত উঠে দাঁড়িয়ে ফণা মেলে প্রচণ্ড জোরে শব্দ করল— ‘ফাঁস’! সেই শব্দ শুনে কঁপে উঠল কিটিরা। সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে টেবিলের ওপর! কিছুক্ষণ ত্রুদ্বভাবে ফাঁস ফাঁস করার পর সাপটা আবার কিমিয়ে পড়ল।

টিনা এবার সাহস করে জিজ্ঞেস করল, ওর কি বিষ আছে?

সাপের দেহের মাঝখানে স্টিকটা গলিয়ে তাকে আবার বাস্তবে ভরতে ভরতে সঞ্জীবন জবাব দিলেন, অবশ্যই।

ইতিমধ্যে আর একটা বাস্ক নিয়ে এসেছে নিরুপম। আগেরটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নতুন বাস্কটা থেকে সঞ্জীবন বার করে আনলেন আর একটা সাপ। আগেরটার মতো বড়ো না হলেও এ সাপটাও বেশ বড়ো। কুচকুচে কালো রং। গলার কাছে একটা সাদা ফেট্রি আছে। সাপটাকে কায়দা করে হুক দিয়ে শূন্যে তুলে ধরে সঞ্জীবন বললেন, একে চলতি ভাষায় বলে কেউটে। ইংরেজিতে বলে ‘ব্ল্যাক কোবরা’। এর বিষ ভীষণ দামি। কেউটের বিষ থেকে ‘কোব্রাক্সিন’ নামে ব্যথার ওষুধ তৈরি হয়। ভারতে ২৩৫ প্রজাতির সাপের মধ্যে ৫০টা প্রজাতি হল বিষধর। তার মধ্যে সবচেয়ে বিষধর চারটি সাপ হল—কেউটে, কালাজ, চন্দ্রবোড়া আর ফুরমা। এদের ছোবল মানেই মৃত্যু বলা যেতে পারে। এই হল তার একটি।

এরপর এক একটা বাস্ক থেকে নানা ধরনের সাপ বার করে কিটিদের দেখাতে লাগলেন তাঁরা দুজন। তিরের ফলার মতো চেপটা মাথা হল চন্দ্রবোড়া, কালো রঙের দেহে সাদা দাগকাটা কালাজ, গায়ে মোজাইকের মতো ডিজাইন আঁকা ফুরমা ইত্যাদি নানা সাপ। আর তাদের দেখানোর সঙ্গেসঙ্গে তাদের



পরিচিতি, স্বভাব, কী বিষ পাওয়া যায় তা বলে যেতে লাগলেন সঞ্জীবন। প্রায় কুড়িটি মতো বিভিন্ন মাপের সাপ দেখাবার পর সঞ্জীবন তাঁর সহকারীকে বললেন, এবার ওদের দুজনের একটাকে আনো।

নিরুপম জিঙ্কস করল, কাদের।

ঘরের দেওয়ালের গায়ে একটা র্যাকে আলাদা করে শুধু একটা বাস্ক রাখা আছে। সঞ্জীবন সেদিকে তাকালেন। তাঁর কথা শুনে মৃদু চমকে উঠে নিরুপম, বলল, ওকে বাইরে বার করবেন স্যার! ওর এখনও তো বিষদাঁত ভাঙা হয়নি! তার ওপর ঘরে ওনারা আছেন!

নিরুপমের কথা শুনে মুহূর্তের জন্য যেন থমকে গেলেন সঞ্জীবন। নিজের মনেই যেন বললেন, হ্যাঁ, ওদের তো আবার অ্যান্টিভেনামও আবিষ্কার হয়নি। তারপর বললেন, তুমি একটা কাজ করো। চোদ্দো নম্বর বাস্কতে যে শঙ্খচূড়টা আছে, তাকে ম্যাডামদের পায়ের কাছে ছেড়ে দাও।

পায়ের কাছে সাপ ছেড়ে দাও মানে? তার কথা শুনে কম্পিত স্বরে বলে উঠল টিনা।

সঞ্জীবন হেসে বললেন, ঘাবড়াবেন না। ও সাপটার বিষদাঁত ভাঙা আছে। আসলে শঙ্খচূড় স্বগোত্রভোজী। অর্থাৎ সাপ হলেও সে আকারে ছোটো অন্য সাপ খায়। তাই অন্য সাপরা তাকে ভয় পায়। যে নতুন সাপটাকে বার করব সে যাতে আপনাদের কাছে না ঘেঁষে তার ব্যবস্থা করছি। অবশ্য আপনাদের আপত্তি থাকলে...।

তার কথা শেষ হবার আগেই কিটি বলে উঠল, না, না আপত্তির কিছু নেই। নতুন সাপটাকে আমি দেখতে চাই। তার জন্য যা ব্যবস্থা করার আপনি করুন।

আগের সাপগুলো যখন দেখানো হচ্ছিল তখন ইতিমধ্যে সাপগুলোর বেশ কিছু ছবি তুলেছে কিটি। সেটা মাথায় রেখেই সঞ্জীবন বললেন, তবে এবার আপনার কাছে অনুরোধ আছে। যাকে দেখাব তার ছবি তুলতে যাবেন না আপনি। একদম নতুন তো, ফ্ল্যাশের ঝলকানিতে বা আপনার নড়াচড়াতে ও বিভ্রান্ত হলে আমার বিপদ হতে পারে। আমিই তো ওর কাছে থাকব!

কিটি জবাব দিল, আচ্ছা।

নিরুপম এবার একটা বিরাট বড়ো শঙ্খচূড় কিটিদের পায়ের কাছে এনে

ছেড়ে দিল। সাপটা একবার মাথা তুলে সম্ভবত কিটিদের দেখার চেষ্টা করে মাটির মধ্যে নিজীব হয়ে শুয়ে পড়ল। কিটি দেখল যদিও এ সাপটার বিষ নেই তবুও টিনার মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মৃদু হেসে কিটি তাকিয়ে রইল ঘরের মাঝখানে টেবিলের দিকে।

নিরুপম সে দুটো বাস্কর একটা এনে টেবিলের ওপর রেখে কিছুটা সরে দাঁড়াল। সঞ্জীবন কিটিদের উদ্দেশে বললেন, সাপটা যতক্ষণ বাইরে থাকবে ততক্ষণ কথা বলা যাবে না। তাই ওকে বার করার আগেই ওর সম্বন্ধে কিছু বলি। এ সাপের নাম ‘ন্যাট্রিক্স’। সাধারণত ন্যাট্রিক্সরা বিষহীন হয়। ঘাসের বনে বা জলা জায়গাতে এরা থাকে। বাসস্থান হল ইরান। কিন্তু ন্যাট্রিক্সের মধ্যে এই একমাত্র প্রজাতি যাদের বিষ আছে। এরা থাকে ইরানের মরু অঞ্চলে। প্রকৃতি তার বিচিত্র খেলালে অন্য সব ন্যাট্রিক্সকে বিষশূন্য করে তাদের সব বিষ যেন ঢেলে দিয়েছে এই প্রজাতিতে। মারাত্মক বিষধর। এর কোনো অ্যান্টিভেনাম নেই। ঘাসবন, জলাজমিতে লুকিয়ে থাকে বলে অন্য ন্যাট্রিক্সদের গায়ের রং কালচে-সবুজ হয়, কিন্তু বালিয়াড়িতে লুকিয়ে থাকে বলে এর গায়ের রং ঈষৎ হলদেটে।

কথা থামালেন সঞ্জীবন। তারপর ঘরের চারপাশে একবার দেখে নিয়ে সম্ভরণে বাস্কর মুখটা খুললেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত বাস্কর ভিতর তাকিয়ে থাকার পর স্নেক স্টিকটা তার ভিতর ঢুকিয়ে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে বার করে আনলেন একটা সাপ। খুব বেশি বড়ো নয়, হাত চারেক লম্বা হবে হয়তো। হলদে রং। খুব বেশি মোটাও নয়। সঞ্জীবন সাপটাকে স্টিক দিয়ে শূন্যে তুলে ধরলেন। ঝুলতে থাকা চেপটা মাথাটা একটু তুলে ধরে ঘরের চারপাশ সম্ভবত দেখার চেষ্টা করতে লাগল সাপটা। তার মুখের ভিতর থেকে লালচে চেরা জিভটা বাইরে বেরোচ্ছে মাঝেমধ্যে। সঞ্জীবন কিটিদের অনেক সাপ দেখিয়েছেন। কিন্তু এ সাপটাকে দেখে এই প্রথম কিটির শরীরে কেমন যেন শিহরন খেলে গেল। কিটি, টিনা তো বটেই এমনকী নিরুপমও যেন পাথরের মূর্তির মতো তাকিয়ে রইল সাপটার দিকে। খুব বেশি হলে দশ-বারো সেকেন্ড। তারপরই আবার সঞ্জীবন সাপটাকে সাবধানে তার বাস্কে পুরে ফেললেন। কিটি খেয়াল করল সঞ্জীবনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠছে। সাপটাকে বাস্কে ঢুকিয়ে তিনিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সঞ্জীবন এরপর কিটিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের সাপ দেখা আজকের মতো শেষ। অন্য একটা ঘরে আমার ল্যাবরেটরি। কাল দেখাব। আমাকে এখন একটু বাইরে কাজে বেরতে হবে।

ন্যাট্রিসের বাস্‌টো নির্দিষ্ট স্থানে রেখে নিরুপম এরপর এগিয়ে এল কিটিদের পায়ের কাছে রাখা সাপটাকে নেবার জন্য। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কিটি এক অদ্ভুত কাণ্ড করল। নীচু হয়ে মাটি থেকে নিজেই তুলে নিল সাপটাকে। সে কিছু বলল না। শুধু তার দেহটা পাক খেতে লাগল কিটির বাস্‌তে।

কিটির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সঞ্জীবন বললেন, যদিও ওর বিষদাঁত ভাঙা তবু সাপ তো! আপনার সাহস আছে বলতে হবে!

সাপটা নিরুপমের হাতে তুলে দিয়ে কিটি বলল, থ্যাঙ্কস।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল সবাই। সঞ্জীবন বললেন, আমাকে এবার গাড়ি নিয়ে বাড়ির বাইরে যেতে হবে। সন্ধ্যার পর ফিরব। আপনারা কী করবেন?

কিটি বলল, আমরা বরং এবার বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখি।

॥ ৪ ॥

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল কিটিরা। টিনা মন্তব্য করল, বাবা বাঁচলাম! সাপের ঘরটা কী ভয়ংকর! বলিহারি তোর সাহস! সাপটাকে ওভাবে তুলে নিলি?

কিটি চারপাশে তাকাতে তাকাতে মন্তব্য করল, এত ভয় নিয়ে তুই আমার অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করবি? এদিকে বাড়িতে থাকতে বললেও থাকবি না। আমার পিছু নিতেই হবে।

গেটের একপাশে একটা কালো রঙের ইউ.এস.ভি. দাঁড়িয়ে আছে। কিটিরা বাইরে বেরোবার সঙ্গেসঙ্গেই তার প্রায় পিছন পিছন বেরিয়ে এলেন সঞ্জীবন। কিটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাবসার কাজে যাচ্ছেন?

সঞ্জীবন বললেন, আরে না না। যাচ্ছি একটা সাবান কিনতে। সামান্য জিনিস কিনতেও বারাসত ছুটতে হবে!

কিটি বলল, সাবান কিনতে বারাসতে?

সঞ্জীবন বললেন, হ্যাঁ। আমি অ্যান্টিসেপটিক সাবান ইউজ করি। এখানকার

দোকানে ওই দামি সাবান পাওয়া যায় না। মাসকাবারি জিনিসপত্রের সঙ্গেই সাবানটা দেওয়ার কথা। বিলেও দাম ধরে নিয়েছে, অথচ সাবানটা দেয়নি। বুঝুন ব্যাপারটা! তবে ওদিকে গেলে আর একটা কাজও সারা হবে। আজকাল ঘুমের ওষুধ ছাড়া আমার ঘুম হয় না। সেটাও কেনা হবে। এই বলে তিনি এগোলেন তাঁর গাড়ির দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি নিজেই ড্রাইভ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কিটি বলল, এ বাড়িতে ঢোকার সময় গাড়িটা কিন্তু দেখিনি। সম্ভবত অন্য কেউ নিয়ে বেরিয়েছিল।

বাগানটা ছোটোখাটো আগাছায় ভরতি। তার মধ্যে দিয়ে কিটিরা এগোল বাড়ির ভাঙা অংশের দিকে। সেদিকের অংশটা প্রায় ধসে গেছে। পিলার আর কপাটহীন দরজা-জানলাওলা কয়েকটা ঘর কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। আলো-আঁধারি খেলা করছে ঘরের ভিতর। ভাঙা অংশের চারপাশে ছড়িয়ে আছে সুরকি আর ভাঙা ইটের স্তূপ। কিটিরা সেখানে উপস্থিত হতেই একটা গোসাপ তাদের পায়ের শব্দ পেয়ে ভাঙা ইটের পাঁজা থেকে বেরিয়ে সামনে দিয়ে ভাঙাবাড়ির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

টিনা বলল, এ বাড়িটার যা অবস্থা তাতে হরর ফিল্মের শুটিং করা যায়। সেই ইটের স্তূপ পেরিয়ে বাড়ির পিছন দিকে এসে দাঁড়াল কিটিরা। অনেকটা ফাঁকা জমি এদিকে। দূরে জমির শেষ প্রান্তে গাছপালার আড়াল থেকে একটা বাড়ি উঁকি দিচ্ছে। বর্ষায় জমিটা গোড়ালি পর্যন্ত জলে ডুবে আছে। ব্যাঙের কলতান চারপাশে। কিটি মন্তব্য করল, বাড়ির এ অংশটা কিন্তু সুরক্ষিত নয়।

বাড়ির দোতলা থেকে একটা ঘোরানো সিঁড়ি নেমে গেছে পেছন দিকে। সেদিক থেকে বাড়িটাকে দেখতে লাগল কিটিরা। হঠাৎ কিটি খেয়াল করল টিনার মুখটা কেমন জানি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেল কিটি। বাড়ির যে অংশে কিটিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ঠিক তার পিছন দিকে দোতলায় একটা ঝুল-বারান্দা রয়েছে। সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন এক ভদ্রমহিলা। শেষ বিকালের সূর্যের আলো এসে পড়েছে সেই বারান্দায়, মহিলার মুখে। কিন্তু কী বীভৎস সেই মুখ! কালো কুচকুচে মুখটা, হাতগুলোও তেমনই কালো। যেন কোনো মানুষ নয় সে, মানুষের অবয়বে কোনো প্রেতমূর্তি! তার মাথায় কোনো চুল নেই। শাড়ি

পর না থাকলে বোঝা যেত না, উনি পুরুষ নাকি মহিলা? কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ভদ্রমহিলা যেন হঠাৎই দেখতে পেলেন কিটিদের। ঠিক যেমন তাকে দেখতে পেয়েছে কিটির। আর সঙ্গেসঙ্গে তিনি দ্রুতপদে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ঘরের ভিতর। দরজাটাও ভিতর থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

কিটি একটু বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, কে উনি? সঞ্জীবনবাবুর স্ত্রী না ভাইয়ের স্ত্রী? ওনার অবস্থা কীভাবে ও-রকম হল?

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর তারা আবার ফেরার পথ ধরল। বাড়ির পিছন থেকে সামনে চলে এল তারা। সারাদিন ধরে বৃষ্টি হবার পর দিনশেষে সূর্যদেব মুখ তুলে চেয়েছেন। বৃষ্টিস্নাত ঝোপঝাড়গুলো আরও সবুজ দেখাচ্ছে বিদায়ী সূর্যের আলোতে। খুব সুন্দর লাগছে চারপাশের পরিবেশ। কিটি বলল, এ আলোকে কী বলে জানিস? বলে কনে-দেখা আলো। এই আলোতে নাকি সব মেয়েকেই পুরুষদের কাছে সুন্দর লাগে!

কোথায় যেন একটা পাখি ডাকছে। বাড়ির ভাঙামহলের সামনের একটা টিপির ওপর বসল দুজন।

টিনা জিজ্ঞেস করল, কী বুঝছিস?

কিটি বলল, সব তো দেখা শুরু করলাম। বুঝব আবার কী? তবে হ্যাঁ, সঞ্জীবনবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট ছেলেটার চেহারাতে একটা সেন্সি লুক আছে। তোর তো আর কোনো গতি হল না, ওকে একবার ট্রাই করতে পারিস। কথা শেষ করে হেসে উঠল কিটি।

টিনা বলল, আমি কেন! তুই নিজেও তো ট্রাই করতে পারিস? তোরও তো জীবনে এসব কিছু হল না, শেষে খুলে বসলি ডিটেকটিভ এজেন্সি! আমার ব্যাপারে ভাবতে হবে না, নিজেরটা ভাব।

টিনা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের পিছনে বাড়ির ভাঙা অংশ থেকে একটা অদ্ভুত খচমচ শব্দ শুনে কথা থামিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল তারা। সেই ভাঙা অংশ থেকে বেরিয়ে আসছে একটা বুড়ো লোক। পরনে ধুতির ওপর একটা পুরোনো ছেঁড়া কোট, চোখে ভাঁটি ভাঙা সুতলি বাঁধা ঘষা কাচের চশমা, বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে সাদা দাড়ি, হাতে একটা লাঠি। টলোমলো পায়ে লোকটা এগিয়ে আসছেন তাদের দিকে। কিটির। উঠে দাঁড়াল।

বৃদ্ধ এগিয়ে এসে কিটিদের সামনে দাঁড়ালেন। চশমাটা একবার ওপরে

উঠিয়ে নিয়ে কিটিদের একবার ভালো করে দেখে নিয়ে একটু সন্দ্বিধভাবে বললেন, তোমরা কারা? এখানে কী করছ?

কিটি জবাব দিল, আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি।

বৃদ্ধ বলে উঠলেন, বেড়াতে এসেছ? সাপের বাসায় কেউ বেড়াতে আসে?

কিটি হেসে বলল, তা আপনি এখানে কী করছেন দাদু? সাপের বাসায় আসতে আপনার ভয় করে না?

তিনি হাতের লাঠিটা একটু তুলে ধরে বললেন, এটা কীসের লাঠি জানো? হেঁতালের লাঠি। চাঁদ সওদাগর এ লাঠি দিয়ে মনসার পিঠে ঘা দিয়েছিলেন। এ লাঠি থাকলে সাপ কাছে ঘেঁষে না। তবে মনসার মাথায় এবার লাঠি পড়বে। ও যে শঙ্খচূড়ের শঙ্খলাগা দেখে ফেলেছে। শেষের কথাটা ফিসফিস করে বলে বৃদ্ধ ছড়া কেটে উঠলেন—

‘কাল কেউটে সাপালি, সাপে সাপে মিতালি

সামাল-সামাল ভাই কাছে যেয়ো না।’

মনসা?

কিটি তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, আপনি কোন মনসার কথা বলছেন?

বৃদ্ধ এবার তাঁর হাতে লাঠি আবার তুলে ধরে বললেন, বলব না, বলব না। তোমাদের সব কথা বলে দিলে শেষে তুমি আমার মানিকটাকে নিয়ে পালাও আর কি? সাপের মাথায় বসে আছে মানিকটা। সাপটাকে মেরে মানিকটা আমিই নেব। ওটা আমার জিনিস, আমি কাউকে তো নিতে দেব না।

আর এরপরই বৃদ্ধর নজর গেল দিনশেষের সূর্যর দিকে। লাঠিটা সেদিকে উঁচিয়ে ধরে বৃদ্ধ বললেন, দেখেছ দেখেছ সূর্যটাকে ঠিক শঙ্খচূড়ের ডিমের কুসুমের মতো লাল দেখাচ্ছে না?

এ-রকম অদ্ভুত উপমা শুনে টিনা ফিক করে হেসে ফেলল। আর সেটা চোখে পড়ে গেল বৃদ্ধর। তিনি বেশ রাগত স্বরে টিনাকে ধমক দিয়ে বললেন, হাসছ কেন? হাসছ কেন? বুঝবে যখন শঙ্খচূড়ের ছোবল খাবে! এই বলে গজগজ করতে করতে বৃদ্ধ বাড়ির পিছন দিকে রওনা দিলেন।

তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবার পর কিটি মন্তব্য করল, এই ভদ্রলোকই তাহলে কাশীনাথ চক্রবর্তী। ভদ্রলোকের অসংলগ্ন কথাগুলো কেমন যেন অদ্ভুত লাগল।

বেলা শেষ হয়ে আসছে, সন্ধ্যা নামবে এরপর। সে জায়গাতে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কিটিরা সেখান থেকে উঠে বাড়ির ভিতর যাবার জন্য এগোল।

ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে তারা এগোতে যাচ্ছিল তাদের ঘরের দিকে। কিন্তু হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল বারান্দার অন্যদিকে ঢোকান মুখটাতে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কিটিদের থেকে বেশ ছোটোই হবে সে। সম্ভবত কুড়ি-একুশ বছর বয়স হবে তার। পরনে ডেনিম জিন্স, লাল টি-শার্ট, পায়ে স্নিকার। সেও দেখল কিটিদের। তারপর তাদের সামনে এগিয়ে এসে বলল, আপনারাই তো খবরের কাগজের লোক তাই না? সাপের ছবি তুলতে এসেছেন?

কিটি জবাব দিল, হ্যাঁ, আপনি?

ছেলেটা করমর্দনের জন্য তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল, বলল, আমি অরিত্র। এ বাড়িতেই থাকি। কিটি খেয়াল করল অরিত্রের বাড়ানো হাতটা কেমন যেন কাঁপছে। ছেলেটার চোখ দুটোও কেমন যেন লাল, মাথার চুল উশকোখুশকো।

কিটি আর টিনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার পর কিটি তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কী করেন?

অরিত্র বলল, এখনও কিছুই করি না। আঙ্কল বলেছে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু দু-মাস তো হয়ে গেল, এখনও কিছুই হল না।

এরপর কিটিদের বেশ অবাক করে দিয়ে সে বলল, আমাকে এক-শো টাকা ধার দেবেন? আঙ্কল ফিরলে ফেরত দেব?

কিটি টাকা বার করে ছেলেটার হাতে দিল। ছেলেটা বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। ঠিক সেই সময় কাছেই একটা ঘরের ভিতর থেকে এক মহিলার গলা শোনা গেল, অরিত্র ফিরেছিস নাকি? বুধিয়া আঙ্কলের কাছে গেছিলি? কথা বলতে বলতে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে কিটিদের দেখে একটু যেন বিস্মিত হলেন তিনি। ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। শ্যামবর্ণা, দীর্ঘাঙ্গী, পরনে একটা ড্রেসিংগাউন।

কয়েক মুহূর্ত কিটিদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর অরিত্রের উদ্দেশে তিনি প্রথমে বললেন, তুমি ঘরে যাও। তারপর কিটিদের বললেন, আসলে, ও একটু অসুস্থ। তা আপনারই তো কাগজের লোক, তাই না?

কিটি জবাব দিল, হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলা এরপর বললেন, ঠিক আছে, পরে হয়তো কথা হবে। এই বলে কৃত্রিম হেসে উনি আবার ঘরের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

নিজের ঘরে ফিরে এল কিটিরা। জানলা খোলা, বাইরে অন্ধকার নামছে। শুধু সন্ধ্যা নামছে বলে নয়, আবার কালো মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কিটি বলল, যার সঙ্গে দেখা হল, তাইলে তিনিই অঞ্জনা। তবে ওর কথায় একটা ব্যাপার খুব অদ্ভুত লাগল!

কী ব্যাপার? জানতে চাইল টিনা।

কিটি বলল, ছেলেটা অসুস্থ, তাই তিনি তাকে ঘরে ঢুকতে বললেন, অথচ তাকে কলকাতায় পাঠালেন?

তুই কী করে বুঝলি?

কিটি জবাব দিল, অঞ্জনা তো জানতে চাইলেন যে অরিত্র বুধিয়া আঙ্কলের কাছে গেছিল কি না? বুধিয়া সম্ভবত সেই বুধিয়া যিনি ক-দিন আগে সঞ্জীবন বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন!

উনি তো আমাদের বললেন যে মিস্টার বুধিয়া এখানেই কোথাও এসেছিলেন?

কিটি বলল, ভেরি গুড! এটা হতে পারে। তাহলে বুধিয়া কি এখানে অন্য কোথাও আসেন? কেন আসেন? ব্যাপারটা একটু খোঁজ করতে হবে।

এরপর একটু থেমে সে বলল, তবে আমার ধারণা অরিত্র বলে ছেলেটা এক অর্থে অসুস্থ। মানে সম্ভবত কোনো নেশা করে। ওর হাত কাঁপছিল। ও যাতে বেফাঁস কিছু না বলে, তার জন্যই ওকে সরিয়ে নিলেন ভদ্রমহিলা।

বাতি জ্বালাল টিনা। বেশ লো ভোল্টেজ। সঞ্জীবন অবশ্য আগেই বলেছিলেন ব্যাপারটা। প্লাগ পয়েন্টে চার্জার কেবলটা লাগিয়ে ল্যাপটপ খুলে বসল কিটি। আর তারপরই বাইরে ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি নামল। আর ঠিক তারপরই বাইরে যেন অস্পষ্ট একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। কি-প্যাডে আঙুল চালাতে চালাতে কিটি মন্তব্য করল, সম্ভবত সঞ্জীবনবাবু ফিরলেন। আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার বাইরে শব্দ শোনা গেল। না সঞ্জীবন নয়, ঘরে ঢুকল মনসা। হাতে দুটো চায়ের কাপ, আর একটা পাত্রে মুড়ি-চপ। কিটি ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে দেখেই, সে কাপ আর বাটি হাতে কিটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, কী দেখছ দিদিমণি? সিনেমা?



কিটি বলল, না সিনেমা নয়। তবে তোমাকে আমি সিনেমার কিছু অংশ দেখাতে পারি।

দেখাবে? এখন একটু সময় আছে আমার হাতে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মনসার চোখ-মুখ।

মনসাকে ল্যাপটপের সামনে বসিয়ে নেট থেকে একটা হিন্দি সিনেমা খুঁজে সেটা চালিয়ে দিয়ে কিটিরা চা-চপ-মুড়ি খেতে শুরু করল। খাটে বসে মনসা বিস্মিত চোখে সিনেমা দেখতে শুরু করল। চা শেষ করে কিটি এরপর প্রশ্ন করল, আচ্ছা সঞ্জীবনবাবুর স্ত্রীও তো এ বাড়িতে থাকেন! ওনাকে একবার দেখলাম না কেন?

ল্যাপটপে চোখ রেখে মনসা জবাব দিল, বড়োমা অসুস্থ, তাই ঘর ছেড়ে বেরোন না।

কী অসুখ? টিনা প্রশ্ন করল।

মনসা বলল, অসুখের নাম জানি না, তবে হাত-পা-র চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গেছে। বড়োমা তো এ গ্রামেরই মেয়ে ছিল। পাগল বুড়োটা বলে বড়োমা নাকি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। ছোটোমার চেয়েও অনেক সুন্দর। মুখ নষ্ট হয়ে গেলে কি কেউ বাইরে বেরোতে পারে? বড়োমা তাই ঘরেই থাকে। বাবুও বেরোতে বারণ করে।

আর ছোটোমা, বাইরে বেরোন?

মনসা জবাব দিল, মাঝেমধ্যে বেরোন। তবে ছোটোমা তো এখানে থাকত না। দু-মাস হল বড়োবাবু এখানে তাঁকে এনেছেন। তবে ছোটো দাদাবাবু বাইরে বেরোন।

কিটি এরপর তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি? আমি কাউকে বলব না। তোমার ছোটো দাদাবাবু কি নেশা করেন?

ল্যাপটপের স্ক্রিনে মোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনসা জবাব দিল, কাউকে বোলো না।

আমি শুনেছি ছোটো দাদাবাবু নাকি সাপের বিষের নেশা করে!

তুমি কী করে জানলে?

একদিন ছোটোমা-র সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল বড়োবাবুর। তখন ছোটোমা বড়োবাবুকে বলছিল, তুমি ওকে সাপের বিষের নেশা ধরিয়েছ কেন? এই নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল।

তার কথা শুনে মৃদু চমকে উঠল কিটিরা। কিটি এরপর তাকে আরও কী একটা কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু মনসা হঠাৎ একটু লজ্জিত স্বরে বলে উঠল, ও মা, সিনেমাতেও আবার শঙ্খলাগা দেখায় নাকি? এ রাম!

কিটিরা তার কথা শুনে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখল, সিনেমায় একটা বেডসিন দেখাচ্ছে। আধো অন্ধকার একটা ঘরে সাপের মতোই পরস্পরকে আলিঙ্গন করে শুয়ে আছে দুজন নরনারী। মনসা সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে এরপর অনেকটা নিজের মনেই বলল, এ শঙ্খলাগা আমি শঙ্খচূড়ের শঙ্খলাগা দেখতে গিয়ে রাতে দেখেছি। ওপাশের ভাঙা ঘরে...।

কথাটা কানে যেতেই কিটি বলে উঠল, এ-রকম শঙ্খলাগা? এ বাড়ির ভাঙা ঘরে?

মনসা এতক্ষণ পর স্ক্রিনের থেকে মুখ তুলে তাকাল কিটির দিকে। কেমন যেন একটা অপ্রস্তুতভাবে সে বলল, না, মানে এ রকম শঙ্খলাগা...।

মনসার কথা শেষ হবার আগেই, ‘আসছি’ বলে ঘরে ঢুকলেন সঞ্জীবন।

তাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল মনসা।

সঞ্জীবন যেন একটু গম্ভীরভাবে বললেন, মনসা কী বলছিল? শঙ্খলাগা না কী-একটা বলছিল শুনলাম?

কিটি চট করে বলল, ও বলছিল এ বাড়িতে নাকি ও সাপের শঙ্খলাগা দেখেছে!

সঞ্জীবন বললেন, তা হতে পারে। এ বাড়ির পাশে তো জলাজমি। সেখান থেকে বাইরের সাপও মাঝেমধ্যে ঢোকে। তবে এই শঙ্খলাগার ব্যাপারে মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণার কথা আপনাদের বলি। অনেক সময় রাস্তার পাশে দাঁড়াশ সাপের যুগল নৃত্য দেখা যায় ওদের প্রজননকালে। কোনো কোনো সময় তারা পরস্পরের লেজ পেঁচিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওই নাচ নাচে। লোকে ভাবে ওরা সংগম করছে। পাড়াগাঁয়ের লোক গামছা পেতে দেয় ওদের দেখে। গামছার ওপর সংগম করলে, সে কাপড়-গামছা ঘরে রাখলে নাকি মনসার কুপা হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে দুটো সাপ নাচছে, সে দুটোই হল পুরুষ সাপ। মিলন ঋতুতে ওরা ওই নাচ নাচে, যাতে অন্য কোনো পুরুষ সাপ ওই এলাকায় আর না ঢোকে। নাচ শেষ হলে তারা দুজন তাদের

সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিলিত হতে চলে যায়। তারা আড়ালে থাকে। সাপের সংগম অনেকটা মানুষেরই মতো। প্রকাশ্যে চোখে পড়ে না।

একটানা কথাগুলো বলার পর সঞ্জীবন বললেন, যাক, এসব কথা আপাতত বাদ দেই। কাজ কিছু এগোল?

কিটি হেসে বলল, না, সব তো এলাম। দেখা যাক। তবে একটা প্রশ্ন আছে। সাপের বিষ দিয়ে কি নেশা করা যায়?

সঞ্জীবন যেন একটু থমকে গেলেন। তারপর একটু চাপা স্বরে বললেন, হ্যাঁ, করা যায়। তবে রিস্ক থেকে যায় মারাত্মক।

কীভাবে?

তিনি বললেন, একটা হাঁড়িতে সাপ রেখে, তার ওপর ঝাঁঝরির মতো ছিদ্রালা ঢাকা চাপা দেওয়া হয়। সাপকে উত্তেজিত করার জন্য সরা চাপা দেওয়া সেই হাঁড়ি ঝাঁকানো হয়। সাপ ভয় পেয়ে বা উত্তেজিত হয়ে ঝাঁঝরিতে ছোবল দেয়। ফুটো দিয়ে সেই বিষ বাইরে এলে তা জিভ দিয়ে চাটা হয়। কারো জিভে বা অস্ত্রে যদি কোনো ক্ষত বা আলসার থাকে তবে ওই বিষ রক্তে মিশে কিন্তু মৃত্যুও হয়। লাতিন আমেরিকার উপজাতিদের আমি ওভাবে নেশা করতে দেখেছি। এরপর তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি এখন যাচ্ছি। কাল আমি আমার ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে দেখাব, কীভাবে বিষ বার করা হয়।

এরপর দু-একটা টুকটাকি কথা বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সঞ্জীবন।

বাইরে ঝামঝাম করে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরের আলোটার তেজও কমে আসছে। কিটি ল্যাপটপটা বন্ধ করে দিল। রাত ন-টা নাগাদ খাবার দিয়ে গেল মনসা। কিন্তু সে আর দাঁড়াল না। কিটিরা খাওয়া শেষ করতে-না-করতেই বাতি নিভে গেল। রাত ন-টার মধ্যেই কেমন যেন নিব্বুম হয়ে গেল বাড়িটা। দুজনে বিছানায় শুয়ে পড়ল। টিনা, কিটিকে জিজ্ঞেস করল, কী বুঝলি?

কিটি জবাব দিল, এখনও বোঝার তেমন সময় আসেনি।

টিনা ঘুমিয়ে পড়ল। অন্ধকার ঘরে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে কিটি চুপচাপ শুয়ে রইল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল টিনা। রাতে হঠাৎ কিটির ধাক্কা তার ঘুম ভেঙে গেল। বেশি রাত অবশ্য হয়নি। সাড়ে বারোটা বাজে। কলকাতায় থাকলে এ সময় তারা রাতের খাবার খেতে বসে। টিনা কিটির ধাক্কা ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, কী হল? ঘরে সাপ ঢুকেছে নাকি?

কিটি চাপা স্বরে বলল, না সাপ ঢোকেনি। একটা জিনিস দেখবি আয়।  
কিটি জানলার সামনে গিয়ে পাল্লার একটু আড়ালে দাঁড়াল। তার পিছনে  
টিনাও গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে বৃষ্টি ধরে গেছে। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ  
উঁকি দিচ্ছে। ব্যাঙের ঐকতান ভেসে আসছে বাড়ির পিছনে জলভরা জমিটার  
থেকে। আর সেই জমিতে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা  
লোক। তার এক হাতে একটা লাঠি, অন্য হাতে ছোট্ট একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনটা  
সে মাঝেমধ্যে ওপরে তুলে ধরছে। জলাজমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা।  
লণ্ঠনটা যেন আরও ভৌতিক করে তুলেছে লোকটাকে। যেন সে কোন জলার  
প্রেত!

টিনা জিজ্ঞেস করল, লোকটা কে বল তো?

কিটি জবাব দিল, সম্ভবত সেই ব্যাংবাবু হবেন। এত রাতে ব্যাং খুঁজতে  
বেরিয়েছেন!

লোকটা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল বাড়ির পিছন দিকে। তারপর জলা-মাঠ  
ভেঙে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল মাঠের শেষপ্রান্তে।

কিটি বলল, নে, এবার শুয়ে পড়। কাল সকাল বেলা উঠব।

॥ ৫ ॥

ভোরবেলা মনসার ডাকেই ঘুম ভাঙল কিটিদের। মেঘ কেটে গেছে।  
ভোরের নতুন আলো ঢুকছে ঘরে। দরজা খুলতেই মনসা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।  
আজ মনসাকে বেশ ঝলমলে লাগছে। তার পরনে একটা রংচঙে ছাপা শাড়ি,  
নতুন ব্লাউজ, ভোরবেলাই মনে হয় স্নান সেরে নিয়েছে সে। হাতে কাচের  
লাল চুড়ি পরেছে, চুলের কাঁটা দিয়ে সুন্দর করে খোঁপা বেঁধেছে।

কিটি তাকে দেখে হেসে বলল, সাতসকালে এত সুন্দর সেজেছ যে!

মনসা হেসে বলল, ওমা সাজব না? আজ কী দিন মনে নেই?

টিনা বলল, কী দিন?

টিনার কথায় মনসা বলল, এটা তো শ্রাবণ মাসের শেষ দিন। এবার  
বলো আজ কোন দিন?

কিটি কিছুটা আন্দাজ করে জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মনসা  
বলে উঠল, এ মা! তোমরা জানো না! আজ তো মা মনসার পূজো।

এ বাড়িতে মনসা পুজো হয়? জানতে চাইল কিটি।

মনসা বলল, না, এ বাড়িতে হয় না। গ্রামে হয়। একথা বলে মনসা তার খোঁপা ঠিক করতে করতে একটু ইতস্ততভাবে বলল, তোমাদের কাছে কিলিপ আছে গো? কাঁটা দিয়ে এত বড়ো খোঁপা আটকানো যাচ্ছে না, খালি খুলে যাচ্ছে!

কিটি হেসে বলল, না গো, ক্লিপ নেই। থাকলে দিতাম। আমাদের কাঁধ পর্যন্ত চুলে ক্লিপ লাগে না।

মনসা বলল, আমি এখন যাই। দুপুর বেলা তোমাদের জন্য মা-র প্রসাদ আনব।

কিটি বলল, আর, আমাদের সেই সাপের শঙ্খলাগা কখন দেখাবে?

মনসা কয়েক মুহূর্ত যেন থমকে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে উঠে ফিসফিস করে রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল, আজ থাকবে তো তোমরা? আজ রাতেই দেখাব। এই বলে সে আবার হেসে উঠে বলল—পাগল বুড়োটা কী বলে যেন? বলে—

কাল কেউটে সাপালি, সাপে সাপে মিতালি

সামাল-সামাল ভাই কাছে যেয়ো না!

আমি তোমাদের সাপের রাজা শঙ্খচূড়ের শঙ্খলাগা দেখাব। ‘শঙ্খচূড় সাপালি, সাপে সাপে মিতালি...’ বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মনসা।

কিটিও বিড়বিড় করে একবার বলল, শঙ্খচূড় সাপালি, সাপে সাপে মিতালি...!

একেবারে তৈরি হয়ে আটটা নাগাদ নীচে নামল কিটিরা। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতেই কিটিরা শুনতে পেল, সঞ্জীবন কার উদ্দেশে যেন বলছেন, কাল কোথায় গেছিলে তুমি? গাড়ির মাইলেজের কাঁটা বলছে, সমস্ত কিলোমিটার গাড়ি চালিয়েছ তুমি! তোমাকে না বলেছি, গাড়ি নিয়ে বারাসাতের বাইরে যাবে না?

যার উদ্দেশে তিনি কথাগুলো বললেন, সে জবাব দিল, হাইওয়ে ধরে কৃষ্ণনগরের দিকে চলে গেছিলাম আঙ্কল।

সঞ্জীবন বললেন, তার মানে চাঁপাডালি হয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরেছিলে! রাস্তায় পুলিশ ধরলে কী হত? তোমার তো আবার ড্রাইভিং লাইসেন্সও নেই।

নীচে নেমেই কিটিরা দেখতে পেল তাদের দুজনকে। সঞ্জীবন আর অরিত্র। তারা দুজনেই একটু যেন থতোমতো খেয়ে গেল কিটিদের দেখে। সঞ্জীবন কাষ্ঠ হেসে কিটিদের বললেন, এ ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যায় না! গাড়ি হাতে পেলেই যেখানে সেখানে চলে যায়!

অরিত্র কিছু বলল না। কিটিদের দিকে একবার তাকিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

সঞ্জীবন, এরপর কিটিদের বলল, চলুন, এবার আমি আপনাদের আমার ল্যাবরেটরিটা আর কীভাবে সাপের বিষ নেওয়া হয় তা দেখাব।

কিটি বলল, হ্যাঁ চলুন।

সঞ্জীবনের পিছন পিছন কিটিরা গিয়ে হাজির হল সাপের ঘরের দুটো ঘরের আগে একটা ঘরে। ভিতরে ঢুকেই তারা দেখতে পেল নিরুপমকে। কিটিদের দেখে মৃদু হাসল সে। কিটিরাও হাসল। বেশ বড় ঘর। জানলা দিয়ে আলো আসছে ঘরে। তা ছাড়া বাতিও জ্বলছে। ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকটা বড়ো বড়ো টেবিল। তার ওপর কাঠের স্ট্যান্ডে রাখা আছে নানা ধরনের কাচের টিউব, ফানেল ইত্যাদি। একটা বেশ বড়ো রেফ্রিজারেটরও একদিকের দেওয়ালের গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সঞ্জীবন নিরুপমকে জিজ্ঞেস করলেন, এনেছ?

নিরুপম, ‘হ্যাঁ স্যার’ বলে টেবিলের ওপর রাখা একটা কাঠের বাস্ক দেখাল।

কিটিরা বুঝতে পারল বাস্কটার মধ্যে সাপ আছে। ও-রকম সাপের বাস্ক সাপের ঘরে গতকালই দেখেছে কিটিরা। যে টেবিলে বাস্কটা রাখা আছে সে টেবিলের সামনে সঞ্জীবনবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিটিরা।

টেবিলের র্যাক থেকে অদ্ভুত একটা কাচের ফানেল তুলে নিলেন সঞ্জীবন। ফানেলের মুখটায় একটা স্বচ্ছ রবারের পর্দা বাঁধা। ফানেলটা ভালো করে পরীক্ষা করে স্ট্যান্ডে রাখলেন তিনি। নিরুপম ঘরের কোনা থেকে একটা স্নেক স্টিক তুলে এনে সঞ্জীবনের হাতে দিল। তিনি কিটিদের দিকে তাকিয়ে একবার শুধু বললেন, ভয় পাবেন না। আপনাদের কেউটের বিষ ভাঙা দেখাব।

কাঠের বাস্কটা খুব সাবধানে খুলে স্নেক স্টিকটা সঞ্জীবন তার মধ্যে ঢোকালেন। একটা চাপা ফোঁসফোঁস শব্দ যেন কানে এল কিটিদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি স্টিক দিয়ে ধীরে ধীরে বার করে আনলেন ফুট চারেক লম্বা একটা কুচকুচে কালো সাপ। স্নেক স্টিকের বাঁকানো অংশ থেকে গলা বুলিয়ে

ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগল সাপটা। কী কুৎসিত দেখতে তাকে! ছোট্ট চোখ দুটোতে জেগে আছে হিংস্রতা। তার লাল চেরা জিভটা মাঝেমধ্যে বাতাসে ছুড়ছে সে। কিটিরও গা শিরশির করে উঠল প্রাণীটাকে দেখে! সঞ্জীবন সাপ-সুন্ধ স্টিকটাকে ডান হাত থেকে বাঁ-হাতে নিলেন। তার স্থির দৃষ্টি সাপটার দিকে নিবদ্ধ। আর তার ডান হাতটা ধীরে নেমে আসতে লাগল সাপটার দিকে। আর এরপরই মুহূর্তের মধ্যে অসাধারণ ক্ষিপ্ৰতায় সঞ্জীবন চেপে ধরলেন সাপটার গলা! সাপটাকে স্নেক স্টিক থেকে টেনে নিলেন তিনি। সাপটার দেহ এবার সঞ্জীবনের বাহু জড়িয়ে পাক খেতে লাগল। সেই কাচের ফানেলটা তুলে নিলেন সঞ্জীবন। সাপটার মুখ তার গলায় সঞ্জীবনের আঙুলের চাপের কারণে ফাঁকা হয়ে গেছে। ওপরের চোয়ালে তার বড়শির মতো বাঁকানো দাঁত দুটো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কিটিরা। সঞ্জীবন সাপের মাথাটা এরপর চেপে ধরলেন ফানেলের রবারের পর্দার ওপর। ক্রুদ্ধ, ভীত সাপটা সঙ্গেসঙ্গে দাঁত বসাতে লাগল সেই পর্দায়। সঞ্জীবন ইশারায় কিটিদের আরও কাছে এগিয়ে আসতে বললেন। কিটিরা এগিয়ে যেতেই সঞ্জীবন চাপা স্বরে বললেন, ফানেলটা ভালো করে লক্ষ করুন।

তারা সেটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সাপটার প্রতিবারের কামড়ের সঙ্গে ফানেলের পর্দা ফুটো হয়ে ঈষৎ হলুদ রঙের তরল পদার্থ টুঁইয়ে নামছে ফানেলের ভিতর। কেউটের বিষ!! বেশ কিছু সময় ধরে ফানেলে সাপের মাথা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন সঞ্জীবন। বিষ গিয়ে জমা হতে লাগল ফানেলের নীচে। কিটিরা মন্ত্রমুগ্ধর মতো দেখতে লাগল সাপের বিষ ভাঙার দৃশ্য। কাজ শেষ হলে সঞ্জীবন সাপটাকে সরিয়ে নিলেন, তারপর তাকে ঢুকিয়ে দিলেন বাস্কর ভিতর। নিরুপম বাস্করটার মুখ বন্ধ করে দিল।

টিনা জিজ্ঞেস করল, এবার এই বিষটাকে নিয়ে কী করা হবে?

সঞ্জীবন জবাব দিলেন, আপাতত এটা ফ্রিজে থাকবে। তারপর শুকিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। বিক্রি মানে বিদেশে যাবে। আমাদের দেশে অ্যান্টিভেনাম তো আগের মতো তৈরি করা হচ্ছে না। দক্ষিণ ভারতের কয়েক জায়গাতে শুধু তৈরি করা হয়। তাদের অবশ্য নিজেদেরই স্নেক ফার্ম আছে। আমাদেরগুলো বিদেশে যায়। তারপর অ্যান্টিভেনাম হয়ে ফিরে আসে। দাম বহুগুণ বেড়ে যায়।

কিটি বলল, এদেশে অ্যান্টিভেনাম তৈরি হচ্ছে না কেন?

সঞ্জীবন একটু আক্ষেপের স্বরে বললেন, সাপের বিষের অ্যান্টিবডি নিয়ে গবেষণা তো এখন প্রায় বন্ধের মুখে। একমাত্র ঘোড়ার রক্তই পারে এই অ্যান্টিবডি তৈরি করতে। রেসের মাঠের বুড়ো ঘোড়া বা পুলিশের বুড়ো ঘোড়া এ কাজে ব্যবহার করা হত। ঘোড়ার রক্তে সাপের বিষ ঢোকাতে হয় অ্যান্টিবডি তৈরির জন্য কিন্তু দেশের সরকার পশুশিক্ষা দূর করতে ঘোড়া নিয়ে এ গবেষণা নিষিদ্ধ করে দিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল মানুষগুলোকে বাঁচাবার জন্য তবে সিরাম কোথায় পাওয়া যাবে তার উত্তর তারা দিল না।

কেউটের বিষটাকে ফানেল থেকে এরপর টেস্টটিউবের মধ্যে ঢালতে ঢালতে সঞ্জীবন বললেন, বিষ ভাঙার পর সাপ দুর্বল হয়ে গেলেও বেশ রেগে থাকে। এখনও ওর যা বিষ আছে তাতে পাঁচটা মানুষকে মেরে ফেলতে পারে।

ফানেল থেকে টিউবে বিষ ঢালা হয়ে গেলে ফ্রিজ খুললেন সঞ্জীবন। ফ্রিজের ভিতরটা বিশেষভাবে তৈরি। সাপের বিষ ভরতি, গায়ে লেবেল আঁটা টেস্টটিউব রাখা আছে ফ্রিজের ভিতর। সেখানেই তিনি রাখলেন টিউবটা। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যাবরেটরি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলে সবাই। সঞ্জীবন বললেন, আমাকে এবার একটু বাইরে যেতে হবে। আপনারা?

কিটি বলল, আপনি যান, আমরা আজ বাড়ির আশপাশ একটু ঘুরে দেখি।

বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল কিটিরা। সুন্দর দিন। বৃষ্টিমাত গাছের পাতাগুলো সূর্যের আলোতে আরও সবুজ লাগছে। পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে। বাড়িটাকে বেড় দিয়ে কিটিরা বাড়ির পিছনের ফাঁকা জমিটায় এসে দাঁড়াল। গোড়ালি পর্যন্ত জল জমে আছে মাঠে। এখানেই গতকাল রাতে ব্যাং-শিকারে বেরিয়েছিলেন ব্যাংবাবু। কিটি একবার তাকাল বাড়ির পিছনের দোতলার সেই বারান্দার দিকে। সেখানে কেউ নেই। লাগোয়া ঘরটার দরজা-জানলাও সব বন্ধ। সেদিকে তাকিয়ে কিটি বলল, সঞ্জীবনবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে একবার আজ দেখা করতে হবে। ওঁকে কাছ থেকে দেখা দরকার।

কোথায় যেন ঢাক বাজছে। সম্ভবত মনসা পুজোর ঢাক। গ্রামের ভিতর থেকে ভেসে আসছে শব্দটা। কিটি বলল, চল, মাঠের ওপাশ থেকে একবার ঘুরে আসি। ওদিক দিয়ে নিশ্চয়ই গ্রামের ভিতরও যাওয়া যায়। জলাজমিটার



একপাশে একটা উঁচু আলের মতো জায়গা আছে। সেটা ধরে মাঠের অন্য প্রান্তে হাঁটতে শুরু করল তারা। যেতে যেতে কিটি বলল, সঞ্জীবনের সঙ্গে অরিত্র বলে ছেলেটার কথাবার্তা শুনলি তো? অরিত্র বলল যে কৃষ্ণগরের দিকে গেছিল। আবার তার মা-র কথা শুনে আমার মনে হয়েছে সে আসলে কলকাতায় মিস্টার বুধিয়ার কাছেই গেছিল। সঞ্জীবনবাবু তার গাড়ির যে কিলোমিটারের হিসাব অরিত্রকে বলছিলেন, তাতে আমারও ধারণা অরিত্র কলকাতাতেই গেছিল। সবটা মিলিয়ে মনে হচ্ছে অরিত্র আর তার ‘মা’ সঞ্জীবনবাবুর অগোচরে মিস্টার বুধিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন! কিন্তু এর কারণ কী? ভাবছি কলকাতায় গিয়ে মিস্টার বুধিয়ার সঙ্গেও একবার দেখা করব।

হাঁটতে হাঁটতে মাঠের অন্যপ্রান্তে এক সময় পৌঁছে গেল কিটিরা। আম, কাঁঠাল, শিমুল—বেশ কিছু গাছের দঙ্গল সেখানে। তার মধ্যে দিয়ে একটা পায়েচলা পথ এগিয়েছে গ্রামের ভিতর। আর সেই পথের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা বাড়ি। পুরোনো দিনের ইটের দেওয়াল, আর অ্যাসবেস্টসের ছাদ। আকারে বেশি বড়ো নয় বাড়িটা। বাইরে থেকে কিটিরা অনুমান করল, সম্ভবত গোটা চারেক ঘর আছে বাড়িটাতে। আর একটা অদ্ভুত জিনিস খেয়াল করল কিটিরা। বাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট বিরাট গাছগুলোর নীচে রয়েছে বেশ বড়ো বড়ো কিছু অগভীর চৌবাচ্চা। অধিকাংশ চৌবাচ্চা ভেঙে গেলেও বেশ কিছু চৌবাচ্চা এখনও মোটামুটি অক্ষত আছে। সম্ভবত বৃষ্টির জলে প্রায় টইটমুর সেই চৌবাচ্চাগুলো। বাড়িটার দরজা আর বেশ কয়েকটা জানলা খোলা, সদর দরজার সামনেটাও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিটি বাড়িটা দেখে বেশ অবাক হয়ে বলল, এ-রকম জংলা জায়গাতে কে থাকে?

কিন্তু তার কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই তার প্রশ্নের জবাব মিলে গেল। বাড়ির ভিতর থেকে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল একজন লোক। তার পরনে ধুতি ফতুয়া। আরে সেই ব্যাংবাবু! নীলকণ্ঠ পালিত!

ভদ্রলোকের সঙ্গে কিটিদের চোখাচোখি হতেই তিনি মৃদু বিস্মিতভাবে বললেন, আপনারা?

কিটি তাঁর দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বললেন, হ্যাঁ, সকালে ঘুরতে বেরিয়েছি, এদিকে চলে এলাম। আপনি এই বাড়িতেই থাকেন?

তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, আসুন,

আসুন, আপনারা ভিতরে আসুন। আমি সঞ্জীবনের ওখানে গেছিলাম, শুনলাম আপনারা খবরের কাগজের লোক!

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে কিটি জিপ্সেস করল, কে কে থাকেন এ বাড়িতে? নীলকণ্ঠ জবাব দিলেন, আমি একলা মানুষ, সংসার বলতে যা বোঝায় তা আমার নেই। আমি একলাই থাকি এ বাড়িতে।

মামুলি ঘর, সামান্য আসবাবপত্র আছে ঘরে। কিটিরা একটা ছেঁড়া সোফায় বসল। নীলকণ্ঠ তাদের মুখোমুখি অন্য একটা চেয়ারে বসার পর টিনা জিপ্সেস করল, বাড়ির বাইরে অনেকগুলো পুরোনো চৌবাচ্চা দেখলাম। ওগুলোতে কী হত?

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, ওইসব চৌবাচ্চাগুলো কিন্তু দেড়-দুশো বছরের পুরোনো। ইংরেজ আমলে এ তল্লাটে নীলচাষ করা হত। নীলগাছ পচানো হত ওইসব চৌবাচ্চাতে। এ তল্লাটে একসময় সর্বত্রই চৌবাচ্চা দেখা যেত। লোকজন ঘরবাড়ি বানাবার জন্য চৌবাচ্চাগুলোর ইট ভেঙে নিয়ে গেছে। কিছু টিকে আছে এখানে-ওখানে। ওই চৌবাচ্চাগুলোর জন্যই ও বাড়িতে আছি। ওগুলো আমার কাজে লাগে।

কিটি জিপ্সেস করল, কেন?

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, বর্ষাকালে ব্যাং ধরে আমি ওই চৌবাচ্চাগুলোর মধ্যে রাখি, তারপর সারাবছর ধরে নানা জায়গাতে সাপ্লাই দেই। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির প্র্যাকটিকাল রুমের জন্য, সঞ্জীবনের ওখানে তো আছেই, তা ছাড়া বুধিয়া স্নেক ফার্ম বলে একটা ফার্মও দেই।

বুধিয়া স্নেক ফার্ম? সেটা কোথায়? জানতে চাইল কিটি।

নীলকণ্ঠ বললেন, ওই স্নেক ফার্মটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তীতে। তবে মিস্টার বুধিয়ার অপিস শিয়ালদার কাছেই। উনি ওখানেই বসেন। তবে মাদ্রাজে ওঁর আরও বড়ো একটা স্নেক ফার্ম আছে।

তঁার কথা শেষ হবার সঙ্গেসঙ্গেই কিটি বলল, আপনার অসুবিধা না হলে মিস্টার বুধিয়ার ঠিকানাটা দেবেন? যদি উনি ওনার স্নেক ফার্মটা আমাদের দেখার অনুমতি দেন, সে ব্যাপারে ওনার সঙ্গে কথা বলব।

নীলকণ্ঠবাবু ভিতরের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে একটা ভিজিটিং কার্ড কিটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এটা রেখে দিন। ওনার কার্ড। ঠিকানা, ফোন নং সব কিছু লেখা আছে এতে।

কিটি বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

ভদ্রলোক এরপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোন কাগজের লোক?

কিটি হেসে জবাব দিল, নির্দিষ্ট কোনো কাগজ নয়, আমরা ফ্রিল্যান্সার। আমি সাধারণত বড়ো কাগজগুলোর জন্যই লিখি। একথা বলতে বলতেই কিটির হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর রাখা একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফের ওপর। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একাট বিশাল অজগর জাতীয় সাপের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নীলকণ্ঠবাবু। কিটি চেয়ার ছেড়ে উঠে সেই টেবিলের সামনে গিয়ে ছবিটা ভালো করে দেখতে দেখতে একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করল, এটা কী সাপ? অজগর?

নীলকণ্ঠ বললেন, ওটা একটা অ্যানাকোন্ডা। তিরিশ ফুট লম্বা সাপটা!

অ্যানাকোন্ডা? বিস্মিতভাবে জিজ্ঞেস করল কিটি।

হ্যাঁ, অ্যানাকোন্ডা। ও ছবি পেরুর জুলজিক্যাল পার্কে তোলা।

আপনি পেরু মানে লাতিন আমেরিকা গেছিলেন? সাগ্রহে জানতে চাইল কিটি।

নীলকণ্ঠবাবু মৃদু হেসে বললেন, হ্যাঁ, গেছিলাম। বছর দুই আগে সঞ্জীবন 'আমাজন কোবরা' খুঁজতে পেরু গেছিল, তার সঙ্গী হিসাবেই গেছিলাম। যদিও শেষপর্যন্ত সাপটাকে ধরা যায়নি, কিন্তু দেশটা সম্বন্ধে একটা অভিজ্ঞতা হল। সেটাই-বা কম কী?

কিটি বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না। আপনি সঞ্জীবন সঞ্জীবন করছেন, উনি কি আপনার বন্ধু-স্থানীয়?

কিটির এই প্রশ্ন শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর নীলকণ্ঠ একটু বিষণ্ণভাবে বললেন, হ্যাঁ, এক সময় সে বন্ধুই ছিল, তবে এখন ও অনেক ওপরে উঠে গেছে। ও এখন স্নেক ফার্মের মালিক, অনেক পয়সা ওর। আর আমি এখন ব্যাংবাবু! দেখলেন তো কাল, ছেলেগুলো কেমন খেপাচ্ছিল আমাকে! এখন আমাদের সম্পর্ক অনেকটা মালিক-কর্মচারীর মতো।

এরপর একটু হেসে নীলকণ্ঠবাবু বললেন, সঞ্জীবন আর তার স্ত্রী, দুজনেই এ গ্রামেরই লোক। সঞ্জীবন অবশ্য বহুদিন এখানে ছিল না। ওড়িশায় একটা স্নেক ফার্মে কাজ করত। বছর পনেরো হল এ গ্রামে ফিরে এসে নিজেই স্নেক ফার্ম খুলেছে।

সামান্য কিছু কথাবার্তার পর কিটি বলল, আমরা এবার যাব, তবে তার আগে আপনার ব্যাঙের সংগ্রহ একবার দেখব। সঞ্জীবনবাবুর সাপের সংগ্রহটা যখন দেখলাম তখন আপনারটাও দেখে যাই।

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, আপনারা পরিহাস করছেন? ব্যাং নিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা খবরের কাগজে লিখবেন না?

কিটি জবাব দিল, না না, পরিহাস নয়। সঞ্জীবনবাবুর মতো আপনার পেশাটাও বড়ো বিচিত্র। যদি আপনাকে নিয়ে একটা ‘কভার স্টোরি’ করা যায় তাই ভাবছি।

কিটির কথা শুনে মৃদু হাসলেন নীলকণ্ঠবাবু। তারপর বললেন, ঠিক আছে, চলুন দেখাচ্ছি।

বাড়ি থেকে নীলকণ্ঠবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে বাড়ির পিছন দিকে যেতেই ব্যাঙের ডাক কানে এল কিটিদের। বাড়ির পিছন দিকে গাছগুলোর নীচে রয়েছে বেশ বড়ো কয়েকটা চৌবাচ্চা। ব্যাঙের অবিশ্রান্ত ডাক ভেসে আসছে চৌবাচ্চা থেকে। যেন পৃথিবীর সব ব্যাং এসে মিলিত হয়েছে এখানে! অদ্ভুত এক কনসার্ট। চৌবাচ্চাগুলো মেরামত করে নেটের ঢাকনা বসানো হয়েছে যাতে ব্যাংগুলো লাফিয়ে বাইরে বেরোতে না পারে সেজন্য। একটা বড়ো চৌবাচ্চার সামনে কিটিদের নিয়ে দাঁড় করালেন নীলকণ্ঠ। তিনি বললেন, কী আর দেখবেন? ব্যাঙের তো আর বিষ নেই। থাকলে ব্যাঙের কদর থাকত। ব্যাং অনেকটা আমারই মতো। বিষগ্নভাবে হাসলেন নীলকণ্ঠবাবু।

চৌবাচ্চার মধ্যে রয়েছে নানা আকারের নানা ধরনের ব্যাং। কেউ জলের মধ্যে ছপছপ শব্দে লাফাচ্ছে, কেউ ডাকছে, কেউ-বা ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে আছে। নীলকণ্ঠবাবু বললেন এক এক ধরনের সাপ কিন্তু এক এক ধরনের ব্যাং খেতে পছন্দ করে। ওই যে সবুজ, রোগাপাতলা ব্যাংগুলো দেখছেন, ওগুলো গেছো ব্যাং। বোরা প্রজাতির সাপরা ওদের খেতে ভালোবাসে। কালো কোনো ব্যাংগুলো ধান ক্ষেতে থাকে। শঙ্খচূড় বা কেউটের প্রিয়খাদ্য ওরা। আবার ওই পেটমোটা কোলা ব্যাঙগুলো দাঁড়াশের খুব পছন্দ।

চৌবাচ্চার মধ্যে ব্যাঙগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ কিটি বলল, আরে ওইটা কী ব্যাং? খুব অদ্ভুত দেখতে তো!

কোনটা? জানতে চাইলেন নীলকণ্ঠ।

কিটি বলল, ওই যে চৌবাচ্চার ওই কোণে যেটা ভাসছে। হলুদ রঙের ব্যাং! পিঠে কালো ডোরা?

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, ওহো ওইটা! ওটাকে আমি গ্রামেরই একটা পুকুর থেকে ধরেছি। আমার ধারণা ওটা কোনো ধরনের কুনো ব্যাংই হবে। প্রকৃতির খেলালে পিঠের চামড়াটা হলুদ হয়েছে। অনেকটা ঠিক মানুষের শ্বেতি রোগের মতো হবে হয়তো।

পরপর বেশ কয়েকটা চৌবাচ্চা ব্যাঙে ভরতি। সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার পর কিটি বলল, ঠিক আছে এবার আমরা চলি। আবার হয়তো দেখা হবে।

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, আমি বিকালের দিকে একবার ও বাড়িতে যাব। আপনারা থাকলে দেখা হতে পারে।

‘আছি’ বলে মৃদু হেসে কিটি ফেরার পথ ধরতে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় গাছপালার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল কিটির। যে পথ ধরে সঞ্জীবনবাবুর বাড়ি ধরে এদিকে এসেছে সে-পথ ধরেই এদিকে আসছেন সেই খেপাটে বৃদ্ধ কাশীনাথ চক্রবর্তী। কিটি তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে নীলকণ্ঠবাবুর মতামত জানার জন্য জিজ্ঞেস করল, ওই যে ভদ্রলোক আসছেন, উনি কে বলুন তো? কাল বিকালে দেখলাম ও বাড়ির বাগানে ঘুরছিলেন? কথাবার্তা কেমন যেন অসংলগ্ন মনে হল।

নীলকণ্ঠবাবু মৃদু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ, ওঁর মাথাটা একটু খারাপ। এ গ্রামেই থাকেন। ওঁর কেউ নেই। মাঝেমধ্যে আমি ওঁকে খাবার দেই। অথচ জানেন, একসময় এ গ্রামের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিল ও। ঘটনাচক্রে কাশীনাথ কাকাও স্নেক ফার্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ওড়িশার একটা বড়ো ফার্ম। যেখানে সঞ্জীবনও কাজ করত এক সময়। সে-ফার্মে শুধু বিষ তোলা নয়, অ্যান্টিভেনামও তৈরি হত সেসময়। জানেন নিশ্চয়ই ঘোড়ার দেহে বিষ ঢুকিয়ে অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয়। কিন্তু সেসব ঘোড়া তারপর বেশিদিন বাঁচে না। কাশীনাথ কাকা কলকাতার রেসের মাঠ থেকে অকেজো ঘোড়া সংগ্রহ করে ওই ফার্মে পাঠাত। রেসের মাঠে যেতে যেতেই কীভাবে যেন ঘোড়দৌড়ের নেশা পেয়ে বসল ওকে। রেসের নেশাতেই সর্বস্বান্ত হলেন, সব কিছু ওর চলে গেল, বিস্তর দেনাও হল। সঞ্জীবন অবশ্য ওর দেনাটা মেটায়। কিন্তু মাথাটা খারাপ হয়ে যায় ওর। এখন সাপের মাথার মণি খুঁজে বেড়ায়...

কিটি প্রশ্ন করল, সঞ্জীবনবাবু ওর দেনা মেটালেন কেন?

নীলকণ্ঠবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, ব্যাপারটা আমি শুনেছি, কারণ জানি না। এবার আপনারা যান, আমিও চলি। বাড়ির দিকে ফিরলেন নীলকণ্ঠ। কিটিরাও নিজেদের পথে পা বাড়াল।

কিছুটা এগোবার পরই তারা মুখোমুখি হয়ে গেল কাশীনাথ চক্রবর্তীর। তিনি কিটিদের দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, কোথায়? ব্যাঙের বাসায় যাওয়া হয়েছিল বুঝি?

কিটি বলল, হ্যাঁ, ব্যাং দেখতে গিয়েছিলাম।

বৃদ্ধ সঙ্গেসঙ্গে ঘাড় দুলিয়ে ছড়া কেটে উঠলেন—

‘সাপের বাড়ি, ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা

খায় দায় গান গায় তাইরে নাইরে না!’

বেশ কয়েকবার ছড়াটা বলার পর থামলেন বৃদ্ধ। তারপর কিটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ওই ব্যাঙের বাসাতে?

কিটির প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ এবার খিঁচিয়ে উঠে বললেন, হ্যাঁ যাচ্ছি। তোমাদের তাতে কী? বুঝবে মজা যখন ব্যাং দিয়ে সাপ খাওয়া!

টিনা হেসে উঠে বলল, ব্যাং দিয়ে সাপ! না সাপ দিয়ে ব্যাং খাওয়াবেন দাদু?

তার কথা শুনে বৃদ্ধ রেগে গিয়ে তাঁর লাঠিটা এমনভাবে উঁচিয়ে ধরলেন যে কিটিরা তফাতে সরে গেল। বৃদ্ধ এরপর আর কোনো কথা না বলে টলোমলো পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন নীলকণ্ঠ পালিতের বাড়ির দিকে।

কিটি মন্তব্য করল, লোকটা সত্যিই অদ্ভুত!

॥ ৬ ॥

বাড়িতে ফিরে এল কিটিরা। দোতলায় ওঠার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন সঞ্জীবনবাবু। তিনি বললেন, কোথায় কোথায় বেড়ালেন?

টিনা জবাব দিল, মাঠের ওপাশে একটু হেঁটে এলাম।

কিটি বলল, একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওনার সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি আমার।

তার কথা শুনে সঞ্জীবন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, ওর

সঙ্গে কথা বলিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু কথা বলে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। আসলে ওর মাথাটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে অনেক সময়।

কিটি জানতে চাইল, কীভাবে?

একটু চুপ করে থেকে সঞ্জীবন বললেন, আসলে এক সময় ও খুব সুন্দরী ছিল। রূপচর্চায় প্রবলভাবে আগ্রহী ছিল। নানান কসমেটিক্স ইউজ করত। আর তার থেকেই বিপত্তিটা ঘটল। বছর দশেক আগে একটা বিদেশি কোম্পানি ময়েশচারিং ক্রিম ইউজ করার ক-দিনের মধ্যে ওর মুখ, সারা শরীরে ঘা ফুটে উঠল। কেমিক্যাল কম্পোজিশনের কোনো গণ্ডগোল ছিল ক্রিমে। অনেক চেষ্টা করেও আর সারল না ব্যাপারটা। আর তারপর থেকেই ধীরে ধীরে মানসিক ডিসব্যালেন্স হতে লাগল ও আর এখন প্রায়...। কথা শেষ করলেন না সঞ্জীবন। তার গলাটা মনে হয় ধরে এল। মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

কিটি বলল, ও, আই অ্যাম সরি। আপনারা মামলা করেননি ওই কোম্পানির বিরুদ্ধে?

সঞ্জীবন বললেন, না, সেটা সম্ভব ছিল না। কারণ, প্রথমত কোম্পানিটা বিদেশি, আর দ্বিতীয় ব্যাপার হল বিনা রসিদে ক্রিমটা কেনা হয়েছিল।

কিটি বলল, বুঝলাম। কিন্তু ওনাকেও আমি একটু দেখতে চাই।

সঞ্জীবন বললেন, ঠিক আছে। আমি ওকে একটু তৈরি করে নিই। অনেক সময় ওর জামাকাপড়ের ঠিক থাকে না। আমি মিনিট দশ পরে আপনাদের ডাকছি।

ঘরে ফিরে এল কিটিরা। তবে মিনিট দশ নয়, আধঘণ্টা পর ডাকতে এলেন সঞ্জীবন। বেশ ক-টা ঘর পেরিয়ে তিনি একটা ঘরে ঢুকলেন কিটিদের নিয়ে। খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবল, সোফা ইত্যাদি আসবারে ভরতি ঘরটা। একটা বাতি জ্বলছে ঘরে। একটা সোফার কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা। মুখ-গা—সারা দেহের চামড়া কেমন যেন পোড়া পোড়া, কালচে খসখসে। মাথায় একটা স্কার্ফ বাঁধা। সম্ভবত তাঁর চুলহীন মাথাটাকে ঢাকার জন্যই। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ভয়াবহ। তাকে ঘিরে চেয়ার নিয়ে বসল কিটিরা। সঞ্জীবন নরম স্বরে বললেন, এনারা তোমার সঙ্গে দেখা করতে

এসেছেন। ভদ্রমহিলা বেশ কিছুক্ষণ কিটিদের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, কারা এরা? হাস্ট-এর লোক? বেশ কাঁপা কাঁপা ভয়াবহ কণ্ঠস্বর মহিলার।

হাস্ট কে? জানতে চাইল কিটি।

হাস্ট হল সেই কোম্পানির নাম, যার ক্রিম মেখেছিল ও। ওর ধারণা, ওই কোম্পানির লোক একদিন ওর কাছে আসবে। নতুন কোনো ক্রিম মাখিয়ে ওকে আবার ঠিক করে তুলবে! চাপা স্বরে কথাগুলো বললেন সঞ্জীবন।

কিটি রুবিদেবীকে বলল, না, আমরা হাস্ট-এর লোক নই। আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি। আপনি কি আমাদের ভয় পাচ্ছেন?

কিটিদের এবার চমকে দিয়ে উচ্চস্বরে খিলখিলিয়ে হেসে রুবিদেবী বলে উঠলেন, ভয়? সাপের বাসায় গোখরো সাপের সঙ্গে যে ঘর করে সে তোমাদের ভয় করবে? তারপরই আবার গলাটা খাদে নামিয়ে বিড়বিড় করে বেশ কয়েকবার বললেন, বিল হাস্ট, বিল হাস্ট!

কিটি এরপর তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, বুঝেছি, আপনি আমাদের দেখে ভয় পাননি। আসলে আমরা এখানে এসেছি একটা কাগজের জন্য সাপ সম্বন্ধে জানতে, সাপের ছবি তুলতে। এ বাড়িতে আমরা আছি। আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছি আমরা।

ভদ্রমহিলা ঘোলাটে চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, সাপের ছবি তুলতে এসেছ? ওর ছবি তুলেছ? এই বলে তিনি আঙুল তুলে দেখালেন কিটিদের পাশে বসা সঞ্জীবনবাবুকে।

কিটি হেসে জবাব দিল, ওনার ছবিও আমরা তুলব। আর আপনার ছবিও।

কিটির কথা শোনামাত্রই ভদ্রমহিলা দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলে বললেন, না না আমার ছবি তুলবে না। আমার ছবি আছে। ওই যে ওই যে দেওয়ালের গায়ে...।

তার কথা শুনে কিটি আর টিনা ঘরের চারপাশে ভালো করে তাকাতেই দেওয়ালের গায়ে দেখতে পেল ছবিটা। বেশ বড়ো বাঁধানো, এক নারীর হাফবাস্ট ছবি। কিটি চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে দাঁড়াল ছবিটার সামনে, অসামান্য রূপসি এক মহিলার ছবি! যেন কোনো ছবির নায়িকা! টিকালো নাক, গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট, হরিণী চোখ যুবতীর মাথায় একরাশ



ঘন চুল। ছবিটা সম্ভবত কোনো স্টুডিয়োতে গিয়ে তোলা হয়েছিল।

কিটি ছবিটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভদ্রমহিলার উদ্দেশ্যে বলল, আপনি খুব সুন্দর দেখতে তো!

কিন্তু কিটির কথা কানে যাওয়ামাত্রই রুবিদেবী উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে চিৎকার করে বলে উঠলেন, না না, আমি সুন্দরী নই, সুন্দরী নই! তারপর টেবিলের ওপর একটা ফুলদানি তুলে নিয়ে কিটির দিকে তাক করে বললেন বেরোও, বেরোও! এখনই এ ঘর থেকে তোমরা বেরিয়ে যাও। নইলে আমি তোমাদের খুন করব!

সঞ্জীবনবাবুও সঙ্গেসঙ্গে উঠে গিয়ে তার স্ত্রীকে নিরস্ত করার জন্য বললেন, আরে আরে এ কী করছ? শান্ত হও, শান্ত হও। ওনারা কী মনে করছেন বলো তো? ওনারা খুব ভালো। তুমি এমন কেন করছ?

কিন্তু রুবিদেবী চিৎকার করতে লাগলেন, বেরোও, বেরোও, নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব। কেউটে লেলিয়ে দেব!

পরিস্থিতি বুঝতে পেরে কিটি বলে উঠল, ঠিক আছে, আপনি শান্ত হোন, আমরা যাচ্ছি, আমরা যাচ্ছি!

কিটি আর টিনা ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতরের চিৎকার থেমে গেল। তারপর এক সময় সঞ্জীবনবাবুও ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছে তিনি কিটিদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি দুঃখিত। এমন ব্যাপার ঘটবে আমি বুঝতে পারিনি। আসলে ওই ছবিটাকে এখন কেউ সুন্দর বললে ও খুব এক্সাইটেড হয়ে ওঠে।

কিটি বলল, আপনার 'সরি' বলার দরকার ছিল না, উনি তো অসুস্থ। আচ্ছা, ওনার এই মাথার গুণ্ডগোলটা কবে থেকে হয়েছে?

সঞ্জীবনবাবু জবাব দিলেন, ওর চেহারাটা ও-রকম হয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই ওকে ধীরে ধীরে মানসিক অবসাদ গ্রাস করতে শুরু করে। তবে মাস তিনেক ধরে ব্যাপারটা পাগলামির রূপ নিয়েছে।

কিটি বলল, ব্যাপারটা বুঝলাম।

সঞ্জীবনবাবু বললেন, এবার তাহলে আপনারা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। আমার একটু অন্য কাজ আছে।

সঞ্জীবনবাবু এরপর নীচে যাবার জন্য সিঁড়ির দিকে এগোলেন, আর কিটিরাও নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরে ঢোকার পর টিনা জিজ্ঞেস করল, কী বুঝলি?

কিটি জবাব দিল, এখনও বোঝার তেমন সময় আসেনি। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি, এখানকার লোকগুলো বেশ অদ্ভুত। এই যেমন, সঞ্জীবনবাবু সাপের বিষ ভাঙেন! রুবিদেবী পাগল! কেউ নেশাগ্রস্ত! কেউ-বা আবার এ বাড়িতে সাপের মাথার মণি খোঁজে! আবার কোনো লোক ব্যাং ধরে। তবে দুজনের সঙ্গে আলাদাভাবে আমাদের এখনও কথা হল না। তাঁরা হলেন, সঞ্জীবনবাবুর সহকারী নিরুপম আর অরিত্রর মা অঞ্জনাদেবী। হয়তো দেখা যাবে তাঁদের চরিত্রেও কিছু অদ্ভুত ব্যাপার আছে। অঞ্জনাদেবীর আচরণ আমার খুব একটা স্বাভাবিক লাগেনি। তিনি যেন ছেলেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে দিতে চাইলেন না।

কিটির কথা শুনে টিনা বলল, তুই মনসার কথা বললি না তো? যে তোকে শঙ্খচূড়ের শঙ্খলাগা দেখাবে বলেছে!

কিটি বলল, মনসাকে কিন্তু আমার বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে। যদিও কেউই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। ওর শঙ্খচূড়-শঙ্খলাগা কথাটার অন্য কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে।

কিটি এরপর একটু ভেবে নিয়ে বলল, ভাবছি কাল মিস্টার বুধিয়ার সঙ্গে দেখা করার একটা চেষ্টা করব। তিনি কেন এখানে এসেছিলেন, বা অরিত্র কেন তার কাছে এসেছিল সেটা যদি কথা বলে জানা যায়? এরপর আর কোনো কথা না বলে কিটি ব্যাগ থেকে একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

দেড়টা নাগাদ দরজা ধাক্কানোর শব্দ শুনে টিনা দরজা খুলে দেখল মনসা এসেছে। তার হাতে শালপাতা চাপা দেওয়া দুটো থালা। ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর থালা দুটো রেখে মনসা বলল, তোমাদের জন্য পুজোর খিচুড়ি এনেছি খাবে তো? নইলে অন্য কিছু করে আনি। বেশি সময় লাগবে না।

শালপাতাটা তুলল মনসা। সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়ির ভুরভুরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। শুধু খিচুড়ি নয়, তার সঙ্গে ফল-প্রসাদও আছে।

কিটি উঠে বসে বলল, তুমি এনেছ আমাদের জন্য, আমরা খাব না? নিশ্চয়ই খাব।

মনসার মুখে সরলতা মাখা একটা হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, তোমরা শহরে থাকো, তাই ভাবছিলাম এসব খাবে কি না? তোমরা খুব ভালো দিদিমণি।

কিটি হেসে বলল, তোমাকে কিন্তু আজ খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। তোমার বর নিশ্চয়ই আজ খুব আদর করবে।

তার কথা শুনে মনসা প্রথমে যেন একটু লজ্জা পেল। তারপর বলল, ওর কথা আর বোলো না। ওর এসবে হুঁশ নেই। সারাদিন গাঁজা খেয়ে ঘরে পড়ে থাকে। আজও তেমনই পড়ে আছে।

মনসা বলল, মাঝে একবার এ বাড়িতে আমি এসেছিলাম তোমাদের খোঁজে। ভাবলাম তোমাদের ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাব। দরজা বন্ধ ছিল। কোথায় গেছলে তোমরা?

কিটি জবাব দিল, প্রথমে মাঠের ওপাশে ওই বনের মতো জায়গাটার ওখানে গেছিলাম। ফিরে এসে ঘরে একবার ঢুকেছিলাম ঠিকই, তারপর তোমার বড়োমার ঘরে গেছিলাম তাঁকে দেখতে।

বড়োমার ঘরে! একটু বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল মনসার মুখে। তারপর সে বলল, ও ঘরে বড়োমা তোমাদের ঢুকতে দিল? সে তো আমাকে আর বড়োবাবু ছাড়া ও ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয় না!

কিটি বলল, আমাদের বড়োবাবুই নিয়ে গেছিল সে ঘরে।

মনসা এবার বেশ আয়েশের স্বরে বলল, কত সুন্দর দেখতে ছিল বড়োমা!

কিটি জানতে চাইল, আচ্ছা মনসা, তোমার বড়োমা কীভাবে ও-রকম হয়ে গেল বলো তো?

মুহূর্ত্থানেক চুপ করে থেকে মনসা বলল, আজ মা মনসার পূজো। আজকের দিনে মিথ্যা বলতে নেই। আমি জানি বড়োমার আসলে কেন এমন হয়েছে! বড়োমা আমাকে বলেছে...

কিটি বলল, কী বলেছেন উনি?

মনসা হয়তো উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ টিনা দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, কে? কে ওখানে?

কিটি সঙ্গেসঙ্গে তাকাল সেদিকে। মনসা ঘরে ঢোকার পর দরজাটা আর বন্ধ করা হয়নি। পাল্লা খোলা, তবে পাতলা একটা পর্দা ঝুলছে। টিনা, কিটিকে

বলল, মনে হল পর্দার আড়াল থেকে একটা ছায়া হঠাৎ সরে গেল!

ছায়া! কথাটা শোনার সঙ্গেসঙ্গেই কিটি তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে পর্দা ঠেলে বারান্দার বাইরে বেরিয়ে এল। আর তার পিছন পিছন টিনাও। কিন্তু শূন্য বারান্দা, কেউ কোথাও নেই। বারান্দার গায়ের সার সার ঘরগুলোর দরজা বন্ধ। কিটি টিনাকে জিজ্ঞেস করল, তুই ঠিক দেখেছিস?

টিনা বলল, হ্যাঁ, তাই তো মনে হল! কে যেন দাঁড়িয়ে আছে!

মনসাও বেরিয়ে এসেছে। কিটির কেন জানি মনে হল, একটা আতঙ্কের ছাপ যেন ফুটে উঠেছে তার মুখে। সে চাপা স্বরে বলল, রাতে এসে আমি তোমাদের সব বলব। শঙ্খচূড়ের শঙ্খলাগা, বড়োমার কেন এমন হল, সব কথা। মনসা এরপর আর দাঁড়াল না। সিঁড়ির দিকে গিয়ে নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল তারা। কিটি বলল, আমার মনে হয় মনসার সঙ্গে কথা বললে বেশ কিছু ব্যাপারে রহস্যভেদ হবে। রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

গরম গরম থিচুড়ি। খেতেও বেশ ভালো। এর সঙ্গে একটু ঘি যদি পাওয়া যেত তবে ফাটাফাটি ব্যাপার হত। খাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে পড়ল কিটিরা।

দুটো নাগাদ বিছানায় শুয়ে ছিল তারা। টিনা ঘুমিয়ে পড়েছিল। বই পড়ছিল কিটি। তারপর একসময় তারও তন্দ্রামতো এসেছিল। বইটা বালিশের পাশে রেখে সবেমাত্র চোখ বুজেছিল সে। হঠাৎ দরজা ধাক্কানোর শব্দে বিছানায় উঠে বসল তারা। দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে কে যেন বলছে, দরজা খুলুন, দরজা খুলুন, একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটেছে!

কিটি তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলেই দেখতে পেল সঞ্জীবনবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট নিরুপমকে। চোখে-মুখে তার স্পষ্ট উত্তেজনার ছাপ। কিটিকে দেখেই সে বলে উঠল, তাড়াতাড়ি নীচে আসুন, ভয়ংকর একটা কাণ্ড ঘটেছে। মনসাকে সাপে কামড়েছে। স্যার ডাকছেন আপনাদের।

তার কথা শোনামাত্র কিটিরা কোনোরকমে পায়ে স্লিপার গলিয়ে ছুটতে ছুটতে নীচে নেমে এল নিরুপমের সঙ্গে। নিরুপম তাদের নিয়ে এগোতে এগোতে বলল, চলুন, সাপের ঘরের কাছেই ঘটেছে ঘটনাটা।

কিটি বলল, বেঁচে আছে? কখন ঘটেছে ঘটনাটা?

নিরুপম বলল, কখন কেটেছে জানি না। আমাকে স্যার বাইরে একটা

কাজে পাঠিয়েছিলেন, বাড়িতে ঢুকতে-না-ঢুকতেই তিনি বললেন, মনসাকে সাপে কেটেছে। তাড়াতাড়ি ম্যাডামদের ডেকে আনো। আমিও ঠিক জানি না ব্যাপারটা। কথা বলতে বলতেই জায়গাটাতে পৌঁছে গেল কিটিরা। ইতিমধ্যেই একমাত্র সঞ্জীবনবাবুর স্ত্রী ছাড়া, বাড়ির সবাই জমা হয়েছে সেখানে। এমনকী মাটিতে পড়ে থাকা মনসাকে ঘিরে সে ভিড়ের মধ্যে ব্যাংবাবু আর কাশীনাথ চক্রবর্তীও আছেন।

মাটিতে পড়ে আছে মনসা। চোখ ওলটানো, মুখ দিয়ে গঁজাল বেরোচ্ছে, মাটিতে পড়ে যাবার ফলে তার কপালের একপাশটাতে অনেকখানি কেটে গেছে। সেখান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে, চুল খুলে ছড়িয়ে পড়েছে। বীভৎস দৃশ্য। সঞ্জীবনবাবু মনসার ডান হাতের কনুইয়ের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধছেন।

দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললেন, এই দেখুন ডান কবজির ওপর দুটো ফুটো। দাগ দেখে গোখরো বলে মনে হচ্ছে। আমি তো ওপরেই ছিলাম...একটু আগে এই কাশীনাথবাবুর চিংকার শুনে নীচে নেমে দেখি এই অবস্থা!

কিটি বলল, ও কি সাপের ঘরে ঢুকেছিল নাকি? ওকে সাপটা কামড়াল কীভাবে?

সঞ্জীবন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সাপের ঘর তো বন্ধ ছিল, বাইরের সাপও হতে পারে। বাড়ির ভাঙা দিকটাতে একটা গোখরো আছে। এমন হতে পারে বাইরে থেকে কামড় খেয়ে ও এখানে এসে পড়েছে।

তার কথা শোনামাত্রই কাশীনাথবাবু বলে উঠলেন, না না বাইরে কামড়ায়নি। ওকে এখানেই সাপ কামড়িয়েছে। একটা মরা সাপ!

সঞ্জীবনবাবু সঙ্গেসঙ্গে তাকে ধমকে উঠে বললেন, মরা সাপ কামড়িয়েছে? এখন আজবাজে বকবেন না, মেয়েটার অবস্থা ভালো নয়, একদম চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন।

একথা বলার পর তিনি নিরুপমের উদ্দেশে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে ওর বরকে ডেকে আনো, আমি অ্যান্টিভেনাম নিয়ে আসছি। এই বলে তিনি বাড়ির দোতলায় সম্ভবত তাঁর নিজের ঘরের দিকে ছুটলেন, আর নিরুপম ছুটল মনসার বরকে ডাকতে। কিটিরা ছাড়া বাকি চারজন দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাংবাবু মনসার দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, অ্যান্টিভেনাম দিয়ে কিছু হবে

বলে মনে হচ্ছে না। এক কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে গেলে বাঁচার হয়তো একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।

তার কথা শেষ হবার সঙ্গেসঙ্গেই অরিত্র হঠাৎ পাশে দাঁড়ানো তার মা-র উদ্দেশ্যে বলল, ওকেও তাহলে মরা সাপ কাটল!

সে চাপাস্বরে কথাটা বললেও সেটা কানে গেল কিটির। সে তাকাল অরিত্রর দিকে। অরিত্র যে নেশা করেছে তা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। চোখ দুটো লাল, মাথার চুল অবিন্যস্ত। হাত কাঁপছে। কিটি তার দিকে তাকাতেই অঞ্জনা ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন, চলো। অনেক লোক আছে। এখানে আর আমাদের থাকার দরকার নেই। ঘরে চলো। এই বলে তিনি প্রায় ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

কিটি ব্যাংবাবুকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কখন এলেন?

তিনি জবাব দিলেন, আপনারা এখানে আসার ঠিক আগের মুহূর্তেই। এই যে থলি। ব্যাং দিতে এসেছিলাম। এসে দেখি এ কাণ্ড। বলেছিলাম না, বিকালে এ বাড়িতে আসব?

কিটি এরপর কাশীনাথ চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করল, আপনি কী করে জানলেন মনসাকে এখানেই সাপে কেটেছে?

কাশীনাথবাবু বললেন, ও মা জানব না। ওকে তো মরা সাপে কাটল! মনসা খিচুড়ি খাওয়াবে বলেছিল। দেখি ও এদিকে আসছে। ওর পিছন পিছন আমিও এলাম। এখানেই সাপটা পড়ে ছিল। সবুজ রঙের একটা মরা সাপ। তার মাথাটা থেঁতলে গেছে, রক্তে মাখামাখি। আমি এ বাড়ির ভিতরে ঢুকলে সঞ্জীবন আমাকে বকাবকি করে। মনসা তাই আমাকে বলল, তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও দাদু। আমি এই মরা সাপটা ফেলে তোমার জন্য খিচুড়ি নিয়ে আসছি। আমি সদর দরজা দিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ চিৎকার শুনলাম, ও দাদু, আমাকে বাঁচান! এখানে ফিরে এসে দেখি মনসা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে! তারপর আমিই তো চিৎকার করে সবাইকে ডাকলাম।

কিটি আবার তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি ঠিক দেখেছেন? সাপটা মরা ছিল?

বৃদ্ধ ঘাড় দুলিয়ে বললেন, তিন সত্যি। এখানেই পড়ে ছিল সাপটা। মাথা থেঁতলানো, রক্তমাখা। কেউ মনে হয় মেরে ফেলে রেখেছিল সাপটাকে।

কিটি তাকাল মেঝের দিকে। অনেক রক্তবিন্দু পড়ে আছে মেঝেতে। সাপের রক্ত যদি এখানে থেকেও থাকে তা আর এখন মনসার রক্তের থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

প্রায় ছুটতে ছুটতেই আবার ফিরে এলেন সঞ্জীবন। এবার তার সঙ্গে নেপালি গেটকিপারও। সঞ্জীবন বসে পড়ে মনসার কাঁধের কাছে ব্লাউজটা একটানে ছিঁড়ে সেখানে ইঞ্জেকশনের নিডলটা ঢুকিয়ে ইঞ্জেকশন দিতে দিতে বললেন, শঙ্খচূড়ই হবে। অনেক বিষ ঢেলেছে। শ্বাসকষ্ট শুরু হল বলে। এখনই ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। যদি বাঁচানো যায়!

কিটি জিপ্সেস করল, কোন হাসপাতাল?

সঞ্জীবন অ্যান্টিডোজটা মনসার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, মেডিকেল কলেজ।

কিটি বলল, আমরাও তাহলে এখন কলকাতা যাব।

সঞ্জীবন আর গেটকিপার মিলে পাঁজাকোলা করে মনসাকে উঠিয়ে নিলেন। মনসার মাথা থেকে একটা চুলের কাঁটা খসে মেঝেতে পড়েছিল কিটিদের ঠিক পায়ের সামনেই। ব্যাংবাবু কাঁটাটা নীচু হয়ে কুড়িয়ে নিয়ে হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, এ কাঁটাটা মনসা আর কোনোদিন মাথায় দিতে পারবে না বলে মনে হয়।

সে-জায়গা থেকে ছুটে গিয়ে ওপরে উঠে নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে নীচে নামতে কিটিদের খুব বেশি হলে মিনিট চারেক সময় লাগল। মনসাকে ততক্ষণে সঞ্জীবন তার গাড়িতে তুলে ফেলেছেন। আকাশ আবার কালো হয়ে আসছে। বৃষ্টি নামবে। কিটিরা দেখতে পেল বাড়ির পিছনদিক থেকে নিরুপমের সঙ্গে দৌড়ে আসছে একটা লোক। কালো শীর্ণ চেহারা, ঝাঁকড়া চুল, পরনে একটা ছাপা লুঙ্গি, খালি গা, গলায় নানা রঙের পাথরের মালা বুলছে। ছুটতে ছুটতে আত্ননাদ করছে, মা তুই আজকের দিনে এ কী করলি? তোকে দুধ-কলা দিয়ে পূজো দিলাম আর তুই বিষ ঢেলে দিলি! মনসার স্বামী।

নিরুপম আর সে গিয়ে উঠে পড়ল সঞ্জীবনবাবুর গাড়িতে। কিটিরাও উঠে বসল নিজেদের গাড়িতে।

হাসপাতাল থেকে দক্ষিণ কলকাতায় নিজেদের বাড়ি ফিরতে কিটিদের প্রায় মাঝরাত হয়ে গেছিল। টিনা সকাল সাতটা নাগাদ ঘুম ভেঙে দেখল কিটি কফিমগ হাতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা থমথম করছে। টিনা তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বলল, কীরে ওদিকের কোনো খবর আছে?

কিটি জবাব দিল, ভোর পাঁচটা নাগাদ সঞ্জীবন ফোন করেছিলেন। গতকাল রাত দেড়টা নাগাদ মনসা এক্সপায়ার করেছে।

টিনা জিজ্ঞেস করল, আমরা কি তাহলে আজ নীলগঞ্জ যাব?

কিটি বলল, না, আজ আর ওখানে গিয়ে তেমন লাভ হবে না। সঞ্জীবনবাবুর বাড়িতে ফিরতে ফিরতে সম্ভবত রাত হয়ে যাবে। হাসপাতালে দুপুরে বডি পোস্টমর্টেম হবে। তারপর বডি রিলিজ হবে। এখানেই দাহকার্য মিটিয়ে তারপর বাড়ি ফিরবেন সঞ্জীবন আর মনসার বর।

এরপর একটু থেমে কিটি বলল, আমার মন বলছে মনসার মৃত্যুটা নিছক অ্যাক্সিডেন্ট নয়। অন্য কিছু ব্যাপার আছে এর মধ্যে। তোর খেয়াল আছে, কাশীনাথ চক্রবর্তী সেদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, মনসার মাথায় লাঠি পড়বে। শঙ্খচূড়ের শঙ্খলাগা যে ও দেখে ফেলেছে! ওর কথাটা সম্ভবত পাগলের প্রলাপ ছিল না। মনসা যে খুন হতে পারে তা কি আগাম আঁচ করেছিলেন বৃদ্ধ। নিশ্চয়ই তাই। আমার আরও ধারণা, মনসার ‘শঙ্খচূড়ের শঙ্খলাগা’ ব্যাপারটার মধ্যে আরও অন্য কিছু লুকিয়ে আছে। মনসা তো আর নেই, যদি বৃদ্ধর মুখ থেকে কিছু জানা যায়...।

কিটি এরপর বলল, তুই স্নান-টান সেরে তৈরি হয়ে নে। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেরোব।

টিনা বলল, কোথায় যাবি?

কিটি জবাব দিল, মিস্টার বুধিয়ার কাছে। একটু আগেই ফোন করেছিলাম। ন-টায় ওর অপিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

টিনা বলল, আমরা সাংবাদিকের পরিচয়েই যাব তো?

কিটি বলল, না, নিজেদের পরিচয় নিয়েই যাব। এবার স্ট্রেইট ব্যাটে খেলতে হবে। নইলে যে প্রশ্নগুলো তাঁকে করতে চাই সেগুলো করা যাবে না। নেট সার্চ করে মিস্টার বুধিয়ার প্রোফাইলও পেয়ে গেলাম। যা বুঝলাম মিস্টার



বুথিয়া সঞ্জীবনবাবুর মতো শুধু সাপের বিষেরই কারবার করেন না, ‘বায়োভেনাম’ বা ‘জৈববিষের’ ব্যাপারে তিনি একজন নামকরা বিশেষজ্ঞ। বেশ ক-টা বইও আছে তাঁর লেখা। বায়োভেনাম নিয়ে তাঁর বেশ কিছু আর্টিকলও আপলোড করা আছে তার ‘ফেসবুক পেজ’-এ। লোকটা পণ্ডিত মানুষ।

ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কিটিরা। জায়গাটা খুঁজতে খুব বেশি বেগ পেতে হল না তাদের। শিয়ালদার জায়গাটা খুঁজতে খুব বেশি বেগ পেতে হল না তাদের। শিয়ালদার কাছে বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রিটে তাঁর অপিস একটা পুরোনো বাড়িতে। পুরোনো দিনের অন্ধকার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কিটিরা ওপরে উঠে এল। দারোয়ানকে মনে হয় মিস্টার বুথিয়া তাদের আসার কথা বলেই রেখেছিলেন। তাকে কার্ড দেখাতেই লোকটা ‘আইয়ে ম্যাডাম’ বলে তাদের অফিসের ভিতর নিয়ে গেল। অনেক ক-জন কর্মচারী কাজ করছেন অফিসে। কিটিরা যখন মিস্টার বুথিয়ার চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন টিনার ঘড়িতে ঠিক ন-টা বাজে। দরজার গায়ে একটা নেমপ্লেটে লেখা আছে— ‘মিস্টার প্রশান্ত বুথিয়া, এম.এসসি., পিএইচ. ডি. এম. ডি., অ্যাঞ্জন বায়োকেমিক্যাল।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল কিটিরা। সুদৃশ্য চেয়ার। ভিতরে এ. সি. চলছে। কাচঢাকা বিরাট বড়ো একটা টেবিলের একপাশে অনেকগুলো গদি সাঁটা চেয়ার। আর অন্য পাশে নিজের চেয়ারে বসে আছেন মিস্টার বুথিয়া। তাঁর পরনে সাদা বুশ শার্ট, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, ফর্সা, সৌম্যদর্শন। তবে মাথার চুলে পাক ধরেছে। ভদ্রলোককে ষাটোর্ধ্ব বলেই মনে হল কিটিদের। কিটি তার ভিজিটিং কার্ডটা বাড়িয়ে দিল মিস্টার বুথিয়ার দিকে। তিনি ইশারায় তাদের চেয়ারে বসতে বলে, কার্ডটা ভালো করে দেখে বললেন, ক্যাটরিনা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি! ক্যাটরিনা সেন কে?

কিটি মৃদু হেসে বলল, আমি কিটি, আই মিন ক্যাটরিনা।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, তা আমার কাছে হঠাৎ গোয়েন্দাদের আগমন কেন?

কিটি জবাব দিল, সঞ্জীবন স্নেক ফার্মের মিস্টার সঞ্জীবনকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন? আমরা ওঁর ওখানে একটা ইনভেস্টিগেশনের একটা কাজ করছি। সে-ব্যাপারেই আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।

ভদ্রলোক কয়েক মুহূর্ত কিটিদের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রথমে বললেন, কী ইনভেস্টিগেশন আপনারা ওখানে করছেন, তা আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করব না। কারণ আমি জানি সেটা আপনি আর আপনার ক্লায়েন্টের গোপন ব্যাপার। তবে একটা জিনিস আপনাদের জিজ্ঞেস না করে পারছি না, গোয়েন্দারা যেখানেই যান, সেখানেই কি তারপর কোনো দুর্ঘটনা ঘটে?

কিটি বলল, মানে?

বুধিয়া এরপর কিটিদের বেশ অবাক করে দিয়ে বললেন, মানে আপনারা স্নেক ফার্মে গেলেন, আর তারপরই বউটা সাপের কামড়ে মারা গেল, তাই জিজ্ঞেস করছি?

কিটি তাঁর কথা শুনে একটু অবাকভাবেই বলল, তার মানে আপনি, ওখানকার সব খবরই রাখেন? মিস্টার সঞ্জীবন বা ওখানকার কেউ আপনাকে ফোন করেছিলেন?

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, ফোন একজন করেছিলেন ঠিকই। তবে তাঁর সঙ্গে ওই স্নেক ফার্মের কোনো যোগাযোগ নেই। কে করেছিলেন, কেন করেছিলেন, সেকথা আমি আপনাদের পরে বলছি। তবে তার আগে আমাকে যে প্রশ্নগুলো করবেন বলে এসেছিলেন, সেগুলো করুন। দেখি তার উত্তর আগে দিতে পারি কি না?

কিটি বুঝতে পারল মিস্টার বুধিয়াও স্ট্রেট ব্যাটে খেলা পছন্দ করছেন। কিটি হেসে বলল, ঠিক আছে তবে তাই করি। দিন পাঁচেক আগে কি আপনি সঞ্জীবনবাবুর স্নেক ফার্মে গিয়েছিলেন? কেন গিয়েছিলেন সে-ব্যাপারে যদি একটু আলোকপাত করেন?

বুধিয়া প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, টেপ রেকর্ডার এনেছেন? শুনেছি গোয়েন্দারা টেপ রেকর্ডারে এসব ইন্টারভিউ রেকর্ড করে পরে তা শোনেন, কারো কথায় কোনো অসংগতি আছে কি না তা ধরার জন্য। এনে থাকলে তা স্বচ্ছন্দে টেবিলে রাখতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি নেই।

ভদ্রলোকের কথায় মৃদু খোঁচা আছে ধরতে পেরে কিটি বলল, না, টেপ রেকর্ডার নেই। এ ব্যাপারে নিজের শ্রবণশক্তি আর স্মরণশক্তি—এ দুটোর ওপরই বেশ আস্থা আছে আমার। আপনি বলুন।

মিস্টার বুধিয়া বললেন, ভেরি গুড! আপনার কনফিডেন্স আছে দেখছি।

হ্যাঁ, আমি সেদিন গিয়েছিলাম ওর ওখানে। আগেও তিন চারবার ওই বাড়িতে গেছি। আমি তো বায়োভেনাম নিয়ে কাজ করি। একটা গবেষণার ব্যাপারে আমার কালাজ সাপের বিষের দরকার ছিল। আমার নিজস্ব স্নেক পার্কে কালাজ নেই। তাই ওর বিষ সংগ্রহের ব্যাপারে সঞ্জীবনের কাছে গিয়েছিলাম। ওর কাছে কালাজ আছে। কিন্তু কাজ হল না। ও কিছুদিন আগেই নাকি বিষ ভেঙেছে সাপটার। আর সেটা বিক্রিও হয়ে গেছে।

কিটি বলল, শুনেছি সাপের বিষ নিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয়। আপনারা দুজন একই পেশায় আছেন, আপনার বা এ পেশায় নিযুক্ত অন্যদের সঙ্গে সঞ্জীবনবাবুর ব্যবসায়িক সম্পর্ক কেমন?

তিনি বললেন, সম্পর্ক মানে ব্যবসায়িক কোনো রেযারেষি আছে কি না জানতে চাচ্ছেন তো। না, আমার সঙ্গে ওর কোনো রেযারেষি নেই। আর এ পেশাতে খুব অল্প পরিমাণ মানুষই নিযুক্ত। ক্রেতার পরিমাণ অনেক বেশি, বিক্রেতা হাতে গোনা। তাই রেযারেষির সম্ভাবনাও কম। আর এ ব্যাপারে আমি নিজের সম্পর্কে একটা কথা বলি আপনাকে। আমি প্রথমে গবেষক, তারপর ব্যবসায়ী। গবেষণার বিপুল খরচ নির্বাহের জন্যই ব্যাবসাটা করতে হয় আমাকে।

কিটি এরপর জানতে চাইল, আপনি তো বেশ কয়েকবার ও বাড়িতে গেছেন। নিশ্চয়ই ও বাড়ির সবার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

মিস্টার বুধিয়া এরপর বললেন, সঞ্জীবনের সঙ্গে আমার নিছকই ব্যবসায়িক সম্পর্ক। তার বাইরে তার বাড়িতে কে কে আছেন তা আমার কাজের মধ্যে ঠিক পড়ে না। আমি জানি না ও বাড়িতে কে কে থাকেন বা কে কী করেন। হ্যাঁ, সঞ্জীবনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যাবসার কাজে কয়েকবার আমার কাছে এসেছে। নীলকণ্ঠ বলে এক ভদ্রলোক আমার ফার্মের জন্য ব্যাং সাপ্লাই দেন, তিনি ও গ্রামেই থাকেন, ও বাড়িতে তাঁর যাতায়াত আছে। তবে দু-দিন আগে একজন এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে, আমি জানতাম না তারা এখন ও বাড়িতে আছে।

কে? কারা? জানতে চাইল কিটি।

অরিত্র মোহন্ত বলে একটা ছেলে। ওকে অবশ্য আমি দেখিনি, ওর বাবার সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রে বছর সাত-আট আগে আমার যোগাযোগ ছিল।

তারপর ব্যবসায় যেমন হয়, কাজ মেটার সঙ্গেসঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। শুনলাম, ওর বাবা নাকি এক বছর হল একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। অনিরুদ্ধ মোহন্তর স্ত্রী, মানে ওর মা আর ও নাকি তারপর সঞ্জীবনী স্নেক ফার্মে এসে আছে। সঞ্জীবনই এনেছে। কিন্তু ওরা নাকি ওড়িশার ভিতরকণিকায় আবার ফিরে যাবে তাদের ফার্মে। তবে তারা আর পৈতৃক ব্যবসা করবে না। সেখানে বেশ কিছু দামি সাপ এখনও আছে। আমি সাপগুলো কিনতে আগ্রহী নাকি, সে ব্যাপারে জানতে এসেছিল।

আপনার সঙ্গে তো যোগাযোগ ছিল না, সে কী করে আপনার খোঁজ পেল?

আমি শেষ যেদিন ও বাড়িতে যাই সেদিন আমাদের কথাবার্তার সময় একবার ঘরে ঢুকেছিল ছেলেটা। সেসময় সঞ্জীবন আমাকে ‘মিস্টার বুধিয়া’ বলে সম্বোধন করেছিল কথার ফাঁকে। আমার ল্যান্ডলাইন নম্বরটা নাকি ওর মা-র কাছে ছিল অনিরুদ্ধর ডায়েরিতে...। তবে আমার কাছে ওর আসার ব্যাপারটা ছেলেটা গোপন রাখতে অনুরোধ করেছে সঞ্জীবনের কাছে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আশা করি আপনারাও ব্যাপারটা গোপন রাখবেন।

কিটি বলল, আপনি নিশ্চিত থাকুন। আপনি সাপ কেনার ব্যাপারে কী বললেন ছেলেটাকে? আপত্তি না থাকলে বলবেন? সঞ্জীবনবাবুর কাছে এটাও গোপন থাকবে।

বুধিয়া জবাব দিলেন, আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না। পরে যেন ওরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। শুনলাম ওর মা-ই নাকি ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

একজন বেয়ারা ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কফি আর বিস্কিট। মিনিটখানেকের জন্য ছেদ পড়ল কিটিদের আলোচনায়। তারপর কিটি আবার শুরু করল, আচ্ছা অরিন্দ্রর বাবা কীরকম অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, সে-ব্যাপারে ও কিছু বলেছে আপনাকে?

চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে মিস্টার বুধিয়া বললেন, অ্যাক্সিডেন্ট মানে সাপের কামড়। তবে ছেলেটা নেশাগ্রস্ত। সম্ভবত সাপের বিষেরই নেশা করে। এ নেশা দুর্লভ। তবে স্নেক ফার্মের সঙ্গে যুক্ত কেউ কেউ এ নেশা করে। এ নেশা কোকেনের নেশার মতো। ছেলেটা এ ব্যাপারে অসংলগ্ন কথা

বলল। সে বলল, একটা মরা সাপ নাকি জ্যান্ত হয়ে উঠে ওর বাবাকে কামড়েছিল। কী সাপ তার নাম অবশ্য বলতে পারেনি ও।

মরা সাপ! কিটির হাতের কাপ থেকে আর একটু হলে কফি ছলকে পড়ছিল।

হ্যাঁ, মরা সাপ! ছেলেটা তো তাই বলল। নেশাখোরের কথা আর কি! হেসে ফেললেন ডক্টর বুধিয়া।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে এরপর কিটি জিজ্ঞেস করল, এবার আপনি বলুন, মনসা, অর্থাৎ স্নেক ফার্মের যে মেয়েটিকে সাপে কেটেছে তার খবর আপনি জানলেন কীভাবে?

বুধিয়া বললেন, মেডিক্যাল কলেজের নিউরোলজির হেড শশাঙ্ক রায় আজ সকালে টেলিফোনে আমাকে ঘটনাটা জানিয়েছেন।

আপনাকে তিনি হঠাৎ ব্যাপারটা জানালেন কেন?

বুধিয়া বললেন, অনেক সময় সরকারি লোকদেরও কোনো কোনো বিষয় বাইরের এক্সপার্টদের সাজেশন নিতে হয় তাই। ডাক্তারদের যে টিম বউটাকে অ্যাটেন্ড করে তার মধ্যে শশাঙ্কও ছিলেন। সাপের বিষে প্রোটিন থাকে। এক ধরনের বিষ স্নায়ুতন্ত্রকে অকেজো করে দেয় যেমন কেউটে, কালাজ বা গোখরোর বিষ। একে বলে নিউরোটক্সিন। আর অন্যটা হল হিমটক্সিন। যা থাকে চন্দ্রবোড়ার বিষে। এ বিষ ব্লাড সেলকে ভেঙে দেয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হল নিউরোটক্সিন আর হিমটক্সিন আমাদের দেশে একসঙ্গে দেখা না গেলেও মেয়েটার সিম্পটম যা ছিল তাতে দুটোরই প্রাদুর্ভাবে মেয়েটার মৃত্যু ঘটেছে ওদের ধারণা। মেয়েটাকে সাপে কাটার পরপরই নাকি পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনাম দেওয়া হয়েছিল। যা সাধারণ বিষধর সাপের বিষের অব্যর্থ প্রতিষেধক। এই অ্যান্টিভেনাম সিরাম দেওয়ার আধঘণ্টা পর শঙ্খচূড় সাপে কাটা রোগীকে উঠে বসে আমি চা খেতে দেখেছি। কিন্তু মেয়েটার ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয়নি। বিষটা যে সাপের তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা কী তা জানবার জন্যই আমার শরণাপন্ন হয়েছেন ডাক্তার শশাঙ্ক। সাপটা মেয়েটার হাতের যেখানে কামড়েছিল, মেয়েটার জীবিতাবস্থায় সেখান থেকে রক্তের নুমনা সংগ্রহ করে রেখেছেন ডাক্তার শশাঙ্ক। তিনি সেটা আমার কাছে পাঠাচ্ছেন। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখি কিছু বলতে পারি কি না।

কিটি বলল, ওটা পরীক্ষা করতে কত সময় লাগবে? আমাদের ফলাফলটা বলতে কোনো আপত্তি আছে?

ডক্টর বুধিয়া বললেন, না আপত্তির কিছু নেই। আর একটু পরই হাসপাতালের লোক এসে ব্লাডটা দিয়ে যাবে। আশা করছি আজ রাতেই পরীক্ষার ফলাফলটা আপনাদের বলে দিতে পারব। আর কোনো প্রশ্ন?

কিটি হেসে বলল, না, আপাতত আর কোনো প্রশ্ন নেই আমার। আপনার থেকে অনেক দরকারি কথা জানলাম। রাতে পরীক্ষার ফল জানার জন্য আপনাকে ফোন করব।

মিস্টার বুধিয়া এবার হেসে বললেন, তবে আমাকেও কিন্তু আপনাদের সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখবেন না। আমার ধারণা ওই মেয়েটার মৃত্যুটা আপনাদের কাছে সন্দেহজনক লাগছে। আমিও কিন্তু বিষের কারবারি। খুনটা আমিও করতে পারি। দেখুন কোনো প্রমাণ পান কি না। তবে এই কেসে কোনো সাহায্যর প্রয়োজন হলে সঙ্গেসঙ্গে আমাকে বলবেন। আমি সাহায্য করব। আমার একঘেষে জীবনে গোয়েন্দাদের সাহচর্যে কিছু বৈচিত্র্য আসবে।

কিটিও হেসে বলল, আমি মোটেও আপনাকে সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখছি না। তবে সাহায্য করবেন জানালেন বলে ধন্যবাদ।

মিস্টার বুধিয়া বললেন, আপনাদেরও ধন্যবাদ। একদিন চলুন না আমাদের ফার্মে। সাপ ছাড়াও আরও কিছু প্রাণী আছে সেখানে। আমি বায়োভেনাম নিয়ে গবেষণা করি। সাপেই শুধু বায়োভেনাম নেই। ফার্মে সাপ তো আছেই। তা ছাড়া আছে কাঁকড়াবিছে, মাকড়সা, পিঁপড়ে এবং কয়েক প্রজাতির মাছও। যাদের বিষ সাপের বিষের চেয়ে কম মারাত্মক নয়। চলুন একদিন?

কিটি চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব একবার।

বাড়ি ফেরার পথে ড্রাইভ করতে করতে কিটি বলল, একবার ভাবছিলাম আজ রাতেই সঞ্জীবনবাবুর ফার্মে যাব, কিন্তু মিস্টার বুধিয়ার পরীক্ষার ফলটা জানা জরুরি। জেনে কাল ভোরেই নীলগঞ্জ যাব। তবে একটা ব্যাপার, সঞ্জীবন অরিত্র আর তার মা-র সম্পর্কে মিথ্যা পরিচয় দিলেন কেন? তারা তো সঞ্জীবনের কেউ হয় না। সঞ্জীবন তাদের ও বাড়িতে হঠাৎ এনে রাখলেন কেন? তবে মিস্টার বুধিয়ার কথা শুনে একটা ব্যাপার মনে হল, সঞ্জীবনবাবুর সঙ্গে নিশ্চয়ই সম্পর্কে চিড় ধরেছে অরিত্র আর তার মায়ের। নইলে তারা গোপনে মিস্টার বুধিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন না।

টিনা জানতে চাইল, মিস্টার বুধিয়াকে কী মনে হল তোর?

কিটি হেসে বলল, পণ্ডিত মানুষ, স্পষ্ট বক্তা, যদিও আমি ওনাকেও সন্দেহের উর্ধ্বে রাখছি না।

বাড়ি ফিরে আসার পর কিটি সারাদিন প্রায় ডুবে রইল তার ল্যাপটপ নিয়ে। বেশ কয়েকবার সে সঞ্জীবনকে মোবাইলে ধরার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার মোবাইলের সুইচড অফ। সম্ভবত চার্জ শেষ হয়ে গেছে মোবাইলের। দিন শেষ হয়ে গেল এক সময়।

সন্ধ্যাটা বই পড়ে কাটাল কিটি। ফেরার পথে কলেজ স্ট্রিট থেকে সাপ নিয়ে লেখা একটা বই খুঁজে এনেছে কিটি। সর্প বিশেষজ্ঞ ‘রস হোয়াইটেকার-এ’ লেখা একটা বই। নানা ধরনের সাপের ব্যাপারে লেখা আছে সে-বইয়ে। রাত দশটা নাগাদ মোবাইল বেজে উঠল কিটির। কলটা রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে ভেসে এল ডক্টর বুধিয়ার গলা—হ্যালো?

কিটি বলল, হ্যাঁ, আমি ক্যাটরিনা বলছি, বলুন?

বুধিয়া ওপাশ থেকে বললেন, পরীক্ষা হয়েছে। বিষটা যে সাপের তাতে সন্দেহ নেই। তবে সাপটা এদেশের পরিচিত কোনো সাপ নয়। গোখরো, চন্দ্রবোড়া বা কেউটে নয়। যদিও কামড়ের দাগটা নাকি গোখরোর মতোই ছিল। এ ব্যাপারে আর কিছু তথ্য পেলে আপনাকে পরে জানাব। সংক্ষিপ্ত কথা বলে ফোনের লাইন কেটে দিলেন তিনি। কিটি মনে মনে বলল, এমনও তো হতে পারে ওই সাপটা ন্যাট্রিক্স!

কিটি টিনাকে বলল, কাল সকালেই আমরা সাপের বাসায় যাচ্ছি। সঞ্জীবনবাবুকে রাজি করাতে হবে যাতে তিনি ওই ন্যাট্রিক্সের বিষ আমাদের কিছুটা সংগ্রহ করে দেন।

ঠিক হল পরদিন ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়বে তারা। ভোরে উঠবে বলে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা দুজনেই। কিন্তু ভোর চারটে নাগাদ কিটি ঘুম ভেঙে উঠে বসার সঙ্গেসঙ্গেই কিটির মোবাইল বেজে উঠল। ওপারে সঞ্জীবনবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট নিরুপমের গলা শোনা গেল। গতকাল রাতে মেডিক্যাল কলেজে মনসাকে অ্যাডমিট করার পর নিরুপম কিটির নম্বরটা নিয়েছিল। সে যা বলল তাতে চমকে উঠল কিটি। নিরুপম বলল, স্যারকে সাপে কেটেছে। উনি জ্ঞান হারিয়েছেন, আমরা স্যারকে মেডিক্যাল কলেজ

নিয়ে যাচ্ছি। রওনা হয়ে গেছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছোব। সম্ভব হলে আপনারা আসুন। লাইনটা কেটে গেল এরপর।

বিশ্ময়ের ঘোর কটতে বেশ কিছুটা সময় লাগল কিটির। তারপর সে একটু দোনোমনা করে একটা নম্বর ডায়াল করল।

রিং হচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পরই ওপাশ থেকে ঘুম জড়ানো গলায় কল রিসিভ করলেন একজন—হ্যালো?

কিটি এপাশ থেকে বলল, সরি ডক্টর বুধিয়া। ভোররাতে আপনাকে বিরক্ত করছি। দুঃসংবাদ আছে। সঞ্জীবনবাবুকে সাপে কেটেছে। মেডিক্যালে আনা হচ্ছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। আমরা ওখানে যাচ্ছি। আপনি একবার আসতে পারবেন ওখানে?

মিস্টার বুধিয়ার ঘুমন্ত ভাবটা যেন কেটে গেল। ওপাশ থেকে গলা শোনা গেল, ঠিক আছে। আমি পৌঁছে যাচ্ছি।

কিটি এরপর ঘুম থেকে তুলল টিনাকে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল তারা।

ঠিক ছ-টায় মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে গেল কিটিদের গাড়ি। ইমারজেন্সির সামনে গাড়ি থেকে নেমেই কিটিরা দেখতে পেল মিস্টার বুধিয়াকে। তার সঙ্গে সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন প্রবীণ ডাক্তার। মিস্টার বুধিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে কিটিদের পরিচয় করিয়ে বললেন, ইনি ডক্টর শশাঙ্ক রায়।

এর মিনিট দশেকের মধ্যেই ইমারজেন্সির সামনে এসে দাঁড়াল সঞ্জীবনবাবুর ইউ.এম.ভিটা। গাড়িতে নিরুপম, গেটকিপার, নীলকণ্ঠবাবু আর অচৈতন্য সঞ্জীবন। স্ট্রেচার রেডি ছিল। গাড়ি থেকে নামিয়ে সঞ্জীবনকে হাসপাতালের ভিতরে নেবার জন্য স্ট্রেচারে তোলা হল। ঠিক যেমনভাবে মনসাকে তোলা হয়েছিল স্ট্রেচারে।

সকাল ন-টা নাগাদ হাসপাতালে কার পার্কিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল কিটিরা। মিস্টার বুধিয়াকে কিটি জিজ্ঞেস করল, সঞ্জীবনবাবুর অবস্থা কেমন বলে মনে হচ্ছে আপনার?

বুধিয়া বললেন, ডক্টর রায়ের সঙ্গে আমি এক মত যে ওকে কেউটে বা কালাজ এ ধরনের কোনো সাপে কেটেছে। কারণ আঘাতটা নেমে এসেছে ওর স্নায়ুতন্ত্রের ওপর। ওর পায়ের ক্ষতটা দেখেও তাই মনে হচ্ছে। ব্লাড



এক্সামিন করার পর ব্যাপারটা বলে দেওয়া যাবে। তবে সমস্যা হল অ্যান্টিভেনাম কোনো কাজ করছে না, প্রায় দু-ঘণ্টা তো হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হয়তো সঞ্জীবনও...। কথাটা মিস্টার বুধিয়া শেষ না করলেও তাঁর বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হল না কিটির।

তিনি একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, তবে একটা জিনিস আপনাদের বলতে পারি যে ওই বউটাকে যে সাপ কেটেছিল সে-সাপ আর এ সাপ আলাদা। কারণ বউটার ক্ষেত্রে নার্স সিস্টেম আর ব্লাড সেল ও দুটোর ওপরই আঘাত হেনেছিল বিষটা!

কিটিদের কয়েক হাত তফাতে বিমর্ষমুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল নিরুপম। বেশ কিছুটা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। কিটি তাকে বলল, আপনি আর একবার বলুন তো ঠিক কীভাবে সঞ্জীবনবাবুকে আপনি দেখতে পেয়েছিলেন?

মাথা নীচু করে নিরুপম জবাব দিল, ভোরে উঠে উনি কলকাতাতে আসবেন বলেছিলেন। তবে কী কাজে তা জানি না। উনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলেন। গতকাল মনসার দাহকার্য শেষ করে গাড়িতে ফেরার সময় উনি আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন তাঁকে ভোর পাঁচটায় ডেকে দেই। আমি রোজ ভোর সাড়ে চারটেয় উঠি, বাড়ির সবার আগে। নীচ থেকে ওপরে উঠলাম আমি। স্যারের দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম পাল্লাটা সামান্য খোলা। ভাবলাম স্যার নিশ্চয়ই নিজেই তাহলে উঠে পড়েছেন। তবু বাইরে থেকে আমি যে তাঁর কথামতো ঘুম ভাঙাতে এসেছি তা বোঝাতে স্যারের উদ্দেশ্যে বললাম, স্যার আপনি উঠেছেন তো? বারকয়েক একথা বলার পরও যখন কোনো উত্তর এল না, তখন আমি পাল্লাটা ফাঁক করে ভিতরে তাকালাম। দেখি স্যারের দেহটা অর্ধেক বিছানায়, আর অর্ধেক মাটিতে। কাছে গিয়ে দেখলাম তাঁর মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরোচ্ছে। জানলা দিয়ে আবছা আলো তখন ঘরে ঢুকতে শুরু করেছে। আমি সঙ্গেসঙ্গে ঘরের বাতিটাও জ্বালিয়ে ফেললাম। তারপর স্যারের ডান পা-টা মেঝে থেকে তুলে তাঁকে ভালো করে বিছানাতে শোয়াতে যেতেই তাঁর পায়ের পাতায় আমার নজরে এল দাগ দুটো। আমি বুঝে গেলাম...।

কিটি জানতে চাইল, আপনি যখন ওপরে উঠলেন তখন অন্য কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন? বা অন্য কোনো ঘরের দরজা খোলা ছিল?

সে জবাব দিল, অরিব্রদের ঘর অন্যদিকে সেটা আমি খেয়াল করিনি।

পরে অবশ্য আমার চিৎকার শুনে তারা ঘর থেকে বেরোয়। স্যারের পাশের ঘরটা অর্থাৎ ম্যাদামের ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধই ছিল। কারণ, আমি তার ঘরের দরজা ধাক্কা দেবার পর তিনি দরজা খোলেন। একথাগুলো বলার পর সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, তবে হ্যাঁ, একজনকে দেখেছিলাম, তবে বাড়ির ভিতরে নয় বাইরে। নীচের বারান্দা থেকে ওপরে ওঠার আগে জানলা দিয়ে এক ঝলকের জন্য বাগানে যেন কাশীনাথ কাকুকে দেখেছিলাম।

কিটি বলল, উনি কি রোজ ভোরে বাগানে আসেন?

নিরুপম জবাব দিলেন, উনি খেপাটে মানুষ, কখন আসেন কখন যান তার ঠিক নেই। আমি একবার মাঝরাতে ওনাকে বাগানে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।

মিস্টার বুধিয়া এরপর কিটির উদ্দেশে বললেন, আমি তাহলে এবার যাই। আর তো এখানে আমাদের কোনো কাজ নেই। ডক্টর রায়ের লোক আমার অপিসে সঞ্জীবনের ব্লাড স্যাম্পল পৌঁছে দেবে বলেছে। ওটা পরীক্ষা করে কী সাপ কেটেছে সেটা আপনাদের জানিয়ে দেব। কেউটে বলেই আমার ধারণা, বউটার বিষের মতো অদ্ভুত কিছু হবে না বলেই মনে হয়। তবে সাপটা অনেক পরিমাণে বিষ ডেলেছে!

কিটি এবার হঠাৎ নিরুপমকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, সেদিন আপনাকে ল্যাবরেটরিতে দেখলাম ফ্রিজের মধ্যে সাপের বিষ রাখা আছে। কোন কোন সাপের বিষ আছে ওখানে?

নিরুপম বলল, সব সাপেরই। যে সাপগুলো আমাদের কাছে আছে। শুধু নতুন সাপটা ছাড়া।

মিস্টার বুধিয়া প্রশ্ন করলেন, নতুন কী সাপ?

কিটি জবাব দিল, ন্যাট্রিস্ক। ইরানের মরুভূমিতে নাকি থাকে। খুব বিষাক্ত সাপ। সঞ্জীবনবাবু একথাই বলেছেন, আপনি কিছু জানেন ওই সাপের ব্যাপারে?

বুধিয়া একটু ভেবে নিয়ে বললেন, নামটা শোনা লাগলেও এই মুহূর্তে ঠিক কিছু মনে আসছে না। আমাদের দেশেই ২৩৬ প্রজাতির সাপ আছে। তার মধ্যে ৫০ প্রজাতি বিষধর। সারা পৃথিবীতে এ সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে, সব মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে খোঁজ নিলে নিশ্চয়ই বলতে পারব।

কিটি বলল, একটা কাজ করা যেতে পারে। ল্যাবরেটরিতে যে ভেনাম স্যাম্পেলগুলো আছে সেগুলো সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলে হয় না? যদি তার সঙ্গে মনসাকে যে সাপ কেটেছে তা ম্যাচ করে? তবে তো বোঝা যেতে পারে সাপটা কী ছিল। ন্যাট্রিক্সেরও বিষ নেওয়া যেতে পারে পরীক্ষার জন্য।

মিস্টার বুধিয়া বললেন তা অবশ্য করা যেতেই পারে।

তাদের কথা শুনে নিরুপম একটু আতঙ্কিতভাবে বলে উঠল, কিন্তু ন্যাট্রিক্সের বিষ ভাঙবে কে। ওর বিষ তো ফ্রিজে নেই।

বুধিয়া তার কথা শুনে হেসে বললেন, ও ব্যাপারটা আমি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তার কথা শুনে নিরুপম একটু আমতা করে বলল, আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। স্যারের অনুমতি ছাড়া তাঁর অবর্তমানে আপনাদের স্যাম্পেল দেওয়া বা ন্যাট্রিক্সের বিষ ভাঙতে দেওয়ার ব্যাপারটা আমি করতে দিতে পারি না।

কিটি তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর নিজের একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে এগিয়ে দিল। নিরুপম কার্ডটা নিয়ে দেখার পর অবাধ হয়ে তাকাল কিটি আর টিনার দিকে। তারপর অস্পষ্টভাবে বলল—আপনারা কি গোয়েন্দা?

কিটি মৃদু হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ, সে-রকম কিছুই ভাবতে পারেন। আপনার স্যারই একটা তদন্তের ব্যাপারে আমাদের অ্যাপয়েন্ট করেছেন। এবার নিশ্চয়ই আপনি এ ব্যাপারে আর আপত্তি করবেন না?

নিরুপম বিস্মিতভাবেই বলল, ঠিক আছে চলুন তবে...।

মিনিটখানেকের মধ্যেই হাসপাতালের গেট ছেড়ে তিনটে গাড়ি রওনা হল নীলগঞ্জের উদ্দেশে। পথে যেতে যেতে কিটি টিনাকে বলল, বাড়ির অন্য তিনজনের সঙ্গেও ওখানে গিয়ে কথা বলতে হবে।

ন্যাশনাল হাইওয়ে থার্টীফোরে জ্যাম ছিল। পৌঁছোতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। গেটম্যান দরজা খোলার পর কিটিদের গাড়িগুলো ভিতরে প্রবেশ করল। গাড়ি থেকে নেমে কিটি বাড়িটার চারপাশে একবার তাকাল। এমনিতেই বাড়িটা নিস্তন্ধ থাকে আজ যেন বাড়িটা আরও থমথমে লাগছে। এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করা একটা মানুষ দু-দিন আগে চলে গেছে, আর বাড়ির মালিক স্বয়ং

হাসপাতালের বেডে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। হয়তো তিনিও পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন। এ দুটো ঘটনা কি খুন? নাকি নিছকই দুর্ঘটনায়, এ প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে কিটির মনে।

বাড়িতে ঢোকার মুখেই দরজার পাশে বিষণ্ণ মুখে নীলকণ্ঠবাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিটিরা। মিস্টার বুধিয়াকে দেখে প্রথমে তিনি একটু বিস্মিতভাবে বললেন, স্যার আপনি? তারপর নিরুপমের উদ্দেশে বললেন, সঞ্জীবন এখন কেমন আছে?

বুধিয়া জবাব দিলেন, হাসপাতাল থেকে খবর পেলাম, তারপর এনাদের সঙ্গে পরিচয় হল, এখানে চলে এলাম।

নিরুপম ব্যাংবাবুর প্রশ্নের জবাবে বলল, অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। অ্যান্টিভেনাম কাজ করছে না।

অ্যান্টিভেনাম কাজ করছে না! বিহুলভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন বিষণ্ণ ব্যাংবাবু।

কিটি তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি খবরটা পেলেন কীভাবে?

ব্যাংবাবু জবাব দিলেন, আমাকে কাশীনাথবাবু গিয়ে প্রথমে খবরটা দেন। প্রথমে খবরটা বিশ্বাস করিনি। এখানে এসে দারোয়ানের মুখে শুনলাম খবরটা সত্যি। নিরুপম হাসপাতালে নিয়ে গেছে ওকে...।

কিটি জানতে চাইল, কাশীনাথবাবু এখন কোথায়?

ওপরে। সঞ্জীবনের স্ত্রীর কাছে। জবাব দিলেন নীলকণ্ঠবাবু।

আর, অরিত্র? অঞ্জনাদেবী?

তারা তাদের নিজেদের ঘরেই সম্ভবত আছেন।

জবাব শুনে কিটি বলল, আপনি ওপরে গিয়ে যে যেখানে আছেন, তাঁদের সেখানেই থাকতে বলুন। কিছু কাজ সেরে আমরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। ব্যাংবাবু কিটির কথায় ঘাড় নাড়ল। কিটিরা এগোল সাপের ঘরের দিকে। সেদিকে যেতে যেতে ওপর থেকে অস্পষ্ট একটা ত্রন্দনধ্বনি ভেসে এল কিটিদের কানে। সম্ভবত সঞ্জীবনবাবুর স্ত্রীর কান্না।

ল্যাবরেটরির সামনে এসে দাঁড়াল সবাই। নিরুপম পকেট থেকে চাবি বার করতেই কিটি জিজ্ঞেস করল, এ চাবিটা কাল রাতে কার কাছে ছিল?

তালা খুলতে গিয়ে কিটির প্রশ্ন শুনে একটু যেন থমকে দাঁড়াল নিরুপম।

তারপর ইতস্তত করে জবাব দিল, আমার কাছেই ছিল। গতকাল রাতে চাবিটা ফেরত দেওয়া হয়নি স্যারকে।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকল কিটিরা। জানলা খুলে, আলো জ্বালানো হল। তাদের ঘরে রেখে নিরুপম বাইরে গিয়ে কোথা থেকে যেন একটা বাস্ক নিয়ে এল। বিশেষভাবে তৈরি বাস্ক। ভিতরে খোপ কাটা আছে। এ বাস্কে সাপের বিষ ক্যারি করা হয়। এরপর সে একটু ইতস্তত করে ফ্রিজটা খুলল। ফ্রিজের ভিতর থরে থরে কাচের টিউবে বিষ রাখা আছে। সাপের বিষ! প্রত্যেকটা টিউবের গায়ে লেবেল আটা। তাতে লেখা আছে সেটা কোন সাপের বিষ। ফ্রিজের ভিতরে তাকিয়ে মিস্টার বুধিয়া বললেন, এখানে যা বিষ রাখা আছে দেখছি, তাতে একটা আস্ত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে! বিষের পাত্রগুলো এরপর সাবধানে নিরুপমের সেই বাস্কর মধ্যে রাখা শুরু করলেন মিস্টার বুধিয়া আর নিরুপম। কাজ করতে করতে মাঝেমধ্যে এক একটা কাচের টিউব হাতে নিয়ে তার গায়ের লেবেলগুলো দেখছিলেন বুধিয়া। তেমনিই একটা টিউব হাতে নিয়ে দেখার সময় তিনি কিটিদের টিউবের ভিতরে থাকা ঈষৎ হলুদ তরলটা দেখিয়ে বললেন, এটা শঙ্খচূড়ের বিষ। এ বিষ একবার দেহে ঢুকলে কেউ বাঁচে না।

টিনা বলল, অ্যান্টিভেনাম নিলেও নয়?

মিস্টার বুধিয়া বললেন, পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনাম নিলে হয়তো অনেক সময় বেঁচে যায়। তবে হ্যাঁ, পৃথিবীতে একজন মানুষ আছেন যিনি অ্যান্টিভেনাম না নিয়েও অনেকবার শঙ্খচূড়ের কামড় খেয়ে বেঁচে আছেন। তিনি অবশ্য আমাদেরই লাইনের লোক। বলা যেতে পারে তিনি সাপ ধরিয়েদের গুরু। ফ্লোরিডাতে থাকেন।

বিস্মিত কিটি জানতে চাইল, কে তিনি?

তিনি জবাব দিলেন, তার নাম বিল হাস্ট।

চমকে উঠল কিটি। বিস্মিত টিনা বলে উঠল, বিল হাস্ট কোনো কসমেটিক প্রোডাক্ট কোম্পানির নাম নয়?

মিস্টার বুধিয়া যত্ন করে সেই বাস্কর মধ্যে টিউবটা রেখে হেসে প্রথমে বললেন, ও নামে কোনো কসমেটিক্স আছে কিনা জানা নেই। সাপের বিষ নিশ্চয়ই কেউ সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য মাখবে না। তবে একই নামে অনেক কিছুই থাকতে পারে।

তারপর বললেন, খুব অদ্ভুত মানুষ এই বিল হাস্ট। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে টাইফয়েড বা কলেরার প্রতিষেধক হিসাবে আমরা যে টিকা নিয়ে থাকি, তা আসলে টাইফয়েড বা কলেরার জীবাণু? বিল হাস্ট দীর্ঘদিন ধরে নিজের দেহে সাপের বিষ ঢুকিয়ে নিজের দেহেই সাপের বিষের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। এ পরীক্ষা করতে গিয়ে বেশ কয়েকবার তার প্রাণ সংশয়ও ঘটেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হন। যে কারণে শঙ্খচূড় কামড় দিলেও তার আজ আর কিছু হয় না। ফ্লোরিডাতে নিজস্ব সর্পোদ্যানে প্রায় দু-শো সাপের কামড় খেয়ে আজও বহাল তব্বিতে বেঁচে আছেন তিনি।

স্যাম্পেলগুলো বাস্তবে পোরা হয়ে যাবার পর মিস্টার বুধিয়া বললেন, এবার তাহলে আসল কাজটা করা যাক। ওই নতুন সাপটার ভেনামের স্যাম্পেল নিতে হবে। সাপের ঘরে যাওয়া যাক।

তার কথা শুনে নিরুপম একটু ভয়ানকভাবে বলল, আপনি ঠিক পারবেন তো স্যার? মিস্টার বুধিয়া শুধু হাসলেন।

সাপের ঘরে গিয়ে ঢুকল কিটিরা। মিস্টার বুধিয়া নিজেই ঘরের কোণ থেকে স্নেক-স্টিক তুলে নিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিরুপমের উদ্দেশ্যে বললেন, সাপ আর ফানেলটা দাও।

নিরুপম আর কোনো কথা বলল না। প্রথমে বিষ ভাঙার রাবারের পর্দা ঢাকা সেই ফানেল, তারপর র‍্যাক থেকে বাস্কেট নিয়ে টেবিলে রেখে একটু তফাতে সরে দাঁড়াল। কিটিরাও টেবিলের বেশ কিছুটা তফাতেই দাঁড়িয়ে। পকেট থেকে রুমাল বার করে কাজ শুরুর আগে চশমার কাচ মুছে নিলেন তিনি। তারপর সাবধানে বাস্কেট খুললেন। স্নেক-স্টিকটা তিনি ভিতরে ঢুকিয়ে তার ডগার হুক দিয়ে ধীরে ধীরে সাপটাকে বাইরে আনলেন। সাপটার দেহের কোনো অংশ ঈষৎ হুলদেটে আবার কোথাও কালচে সবুজ। বেশ কিছুক্ষণ সাপটাকে পর্যবেক্ষণ করলেন মিস্টার বুধিয়া, তারপর হঠাৎই বিদ্যুতের চেয়েও ক্ষীপ্রগতিতে অন্যহাতে চেপে ধরলেন সাপটার গলা। স্টিক থেকে সাপটাকে খুলে নেবার পর ফানেল তুলে নিয়ে তার মধ্যে চেপে ধরলেন ন্যাট্রিক্সের মুখ। বারকয়েক তাতে কামড় বসাবার পর, সাপটার মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বিষ চুইয়ে পড়তে লাগল ফানেলের ভিতর। কাজটা শেষ হতে মিনিট তিন সময় লাগল। তারপর সাপটাকে তিনি আবার বাস্তবে পুরে ফেললেন। কিটিরা

সবাই এবার এগিয়ে গিয়ে মিস্টার বুধিয়ার সামনে দাঁড়াল। কিটি মন্তব্য করল, অবিশ্বাস্য!

মিস্টার বুধিয়া আলোর দিকে ফানেলটাকে উঠিয়ে ধরে বিষটা দেখতে দেখতে বললেন, সত্যি কথা বলতে কী, এ সাপ আমি আগে দেখিনি। ওর স্বভাবচরিত্র জানা নেই আমার। তাই সাপটাকে ধরার আগে আমারও একটু টেনশন হচ্ছিল। ব্যাপারটা আমি আপনাদের বুঝতে দিইনি। যাক, আমার কাজ শেষ, কলকাতায় ফিরে গিয়েই আমি এ বিষটা নিয়ে প্রথমে পরীক্ষায় বসব। তবে অন্য সব স্যাম্পেল পরীক্ষা করতে আরও দু-দিন সময় আমার লাগবে। ভাবছি সব স্যাম্পেল নিয়ে দু-দিনের জন্য আমার স্নেকফার্মে চলে যাব। ওখানে আমার কাজের সুবিধা বেশি।

সাপের ঘর ছেড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এল সকলে। কিটি মিস্টার বুধিয়াকে বলল, আপনি বরং রওনা হয়ে যান। আমরা পরে আসছি।

মিস্টার বুধিয়া বিষের বাস্ক নিয়ে চলে যাবার পর কিটিরা দোতলায় সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। নিরুপম নীচেই দাঁড়িয়ে রইল।

দোতলায় ওঠার মুখেই আর একটু হলে ধাক্কা লাগছিল কাশীনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে। প্রায় হুড়মুড় করে নীচে নামছিলেন তিনি। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। তারপর কিটিদের উদ্দেশ্যে বললেন, এবার মজা বুঝবে! বিষের জ্বালা কেমন তা টের পাবে! ঘা ফুটে বেরোবে সারা দেহে! ঘা ফুটে বেরোবে!

কিটি তার উদ্দেশ্যে বলল, আপনি কি আমাদের অভিষাপ দিচ্ছেন?

তার কথা শুনে প্রথমে হো হো করে হেসে উঠলেন কাশীনাথ চক্রবর্তী। তারপর চারপাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন, একটা কথা বলি, কাউকে বোলো না তোমরা। যে মণিটা খুঁজছিলাম সেটা পেয়ে গেছি!

কিটি জানতে চাইল, কোথায় পেলেন? বৃদ্ধ এবার চোখ পাকিয়ে বললেন, সেকথা তোমাদের বলতে যাব কেন? পথ ছাড়ো! পথ ছাড়ো! কিটিদের প্রায় ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন বৃদ্ধ।

ওপরের বারান্দায় উঠেই কিটিরা দেখতে পেল অরিব্রকে। কিটিদের দেখেই বেশ উত্তেজিতভাবে সে বলল, আপনারা এসেছেন! কিন্তু যাঁর কাছে এসেছেন তিনি তো হাসপাতালে। সঞ্জীবন আঙ্কলকে সাপে কেটেছে! শুনেছেন ঘটনাটা? অরিব্রর চোখ বেশ লাল। সম্ভবত সে এ অবস্থাতেও নেশা করে আছে।

কিটি বলল, হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমরা জানি। হাসপাতাল থেকেই আমরা আসছি।

হাসপাতাল থেকেই আসছেন? সঞ্জীবন আঙ্কল কেমন আছেন? ব্যগ্রভাবে জানতে চাইল অরিত্র।

কিটি জবাব দিল, আছেন একরকম।

অরিত্র এবার বিড়বিড় করে বলল, উনি, না ফিরলে তো সাপের ঘর খোলা যাবে না। তাহলে আমার কী হবে?

কিটি জানতে চাইল, সাপের ঘর খোলার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? ছেলেটা বলল, সাপের ঘর খোলা না হলে আমি ও জিনিস পাব কোথায়? আমার কাছে যা ছিল সব শেষ।

কী জিনিস? টিনা এবার জানতে চাইল তার কাছে।

টিনার প্রশ্নর জবাবটা দিতে গিয়েও যেন কাকে দেখে থেমে গেল অরিত্র। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে কিটিরা দেখল বারান্দাতে একটা ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অঞ্জনা দেবী। তবে সেটা তাঁর নিজের ঘর নয়, রুবিদেবীর ঘরের সামনে। কিটিদের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হতেই তিনি তাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, ওকে কোনো প্রশ্ন করবেন না, ও অসুস্থ, কোনো কিছু জানার থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

কিটি জিজ্ঞেস করল, আপনার ছেলের কী অসুখ তা জানতে পারি?

অঞ্জনা দেবী স্পষ্ট জবাব দিলেন, ওর নিউরো প্রবলেম আছে। ও সাপের বিষের নেশা করে। আর তার থেকেই ব্যাপারটা হয়েছে।

এ নেশা উনি কীভাবে ধরলেন তা জানতে পারি?

ভদ্রমহিলা প্রশ্ন শুনে কিটির চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর বললেন, এ প্রশ্নর জবাব এখন আমি দেব না। আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে।

কী প্রশ্ন? জানতে চাইল কিটি।

তিনি বললেন, শুনেছিলাম আপনারা সাংবাদিক-ফটোগ্রাফার! কিন্তু আপনার প্রশ্ন ও চলাফেরার ধরন দেখে আমার ধারণা হচ্ছে আপনারা অন্য কেউ। এতক্ষণ তো আপনারা সাপের ঘরে ছিলেন, তাই না? অনেকক্ষণ আগেই তো আপনাদের এ বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি। সঙ্গে বুধিয়াও ছিলেন। ওপর



থেকে একটু আগে তাঁকে চলেও যেতে দেখলাম। আপনারা যদি আমাদের এই বিপর্যয়ের খবর শুনে সহানুভূতি জানাতেই আসতেন তবে সাপের ঘরে না গিয়ে আগে ওপরে আসতেন। আপনারা কি এখানে কোনো তদন্ত করতে এসেছেন? পুলিশের লোক? বা ও ধরনের কেউ?

কিটি জবাব দিল, আমরা পুলিশের লোক নই ঠিকই। তবে তদন্ত যে একটা করতে এসেছি সে-ব্যাপারটা আর গোপন করছি না। আমরা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির লোক।

দেখুন, তবে তদন্ত করে। একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল ভদ্রমহিলার ঠোটে। নিজের ঘরের দিকে এরপর তিনি এগোলেন। অরিত্র তাঁকে অনুসরণ করল। তারা দুজন নিজেদের ঘরে ঢোকার পর সে-ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর কিটিরা গিয়ে ঢুকল রুবিদেবীর ঘরে।

খাটের এক কোণে খাটের ছত্রটাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছেন রুবিদেবী। শূন্য দৃষ্টি তাঁর চোখে। খাটের কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন নীলকণ্ঠবাবু। কিটি ঘরে ঢুকে খাটের কাছে গিয়ে রুবিদেবীকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কেমন আছেন? রুবিদেবীর চোখের দৃষ্টি একইরকম রইল। যেন পাশে দাঁড়ানো কিটির উপস্থিতি টেরই পাচ্ছেন না তিনি। একটু ইতস্তত করেই কিটি তার কাঁধে হাত রেখে নরমভাবে আবার জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন?

কিন্তু একইভাবে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন ভদ্রমহিলা। খাট ছেড়ে কিটি এবার এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল নীলকণ্ঠবাবুর সামনে। চোখের ইশারায় জানতে চাইল রুবিদেবীর অবস্থা কী মনে হচ্ছে।

নীলকণ্ঠবাবু চাপা স্বরে বললেন, ওনার এ অবস্থা মাঝেমধ্যেই হয়। এ আচরণ আজকের ঘটনা নয়। টানা চার-পাঁচদিনও মাঝেমধ্যে চুপচাপ বসে থাকেন। সঞ্জীবন ডাক্তারও দেখাচ্ছিল...

তারপর তিনি মাথা নেড়ে আশ্কেপের সুরে বললেন, সঞ্জীবনের কিছু হয়ে গেলে ওনার কী হবে কে জানে! হাজার কাজের মধ্যেও ওর খেয়াল রাখতে সঞ্জীবন কখনো ভুলত না...

সকাল থেকেই কেমন যেন গুম মেরে বসে ছিল কিটি। টিনা কোনো প্রশ্ন করলে সে শুধু ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’-এ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছে। ডক্টর রায় হাসপাতাল থেকে একটু বেলার দিকে ফোন করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন সঞ্জীবনবাবু এ যাত্রায় বেঁচে গেলেও, হয়তো তার পক্ষে না বাঁচাই ভালো ছিল। বিষ তার স্নায়ুতন্ত্রে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে সেটা প্রায় অকেজো হয়ে গেছে। হাঁটাচলা তো দূরে থাক, জীবনে আর কোনোদিন হাত-পা নাড়ানো বা কথাবার্তাও তিনি বলতে পারবেন না। জীবনমৃত অবস্থায় বাকি জীবনটা তাকে বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে। আর একটা কথা, বায়োভেনামের কম্পোজিশনটাও নাকি তার কাছে বেশ রহস্যময় বলে মনে হয়েছে!

কিটি সারাদিনে একটাই বাক্য শুধু উচ্চারণ করেছে টিনার উদ্দেশ্যে—আমার কাজ ছিল ক্ল্যায়েন্টকে প্রোটেক্ট করা, সে-কাজটা আমি করতে পারলাম না।

বিকালের দিকে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। টিনা বলল, আজ বরং খিচুড়ি আর ডিম ভাজা করি?

কিটি একটু উদাসীনভাবে বলল, যা ভালো মনে হয় কর।

সন্ধ্যা নাগাদ কিচেনে ঢুকল টিনা। আর কিটি বসল তার ল্যাপটপ নিয়ে। কিচেনেই তখন ছিল টিনা। হঠাৎ সে কিটির গলা শুনল, অদ্ভুত, আশ্চর্য! কার সঙ্গে কথা বলছে কিটি?

কিচেন ছেড়ে ঘরে ঢুকেই টিনা দেখতে পেল ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে আছে কিটি। টিনা কিটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। স্ক্রিনে ফুটে আছে একটা ছবি। একটা মরা সাপ। তার মাথাটা খেঁতলে গেছে, রক্ত ছড়িয়ে আছে তার খেঁতলানো মাথা ও তার মাথার চারপাশের মাটিতে।

সেই ছবির দিকে চোখ রেখে কিটি স্বগতোক্তি করল, এই সাইটটা এত পরে আমার চোখে পড়ল!

কিটির কথা শুনে টিনা বলল, এই মরা সাপের ছবিতে কী আছে?

কিটি উত্তেজিতভাবে জবাব দিল। অনেক কিছু! অনেক কিছু! একটা রহস্যের জট অস্তত খুলে গেল!

টিনা জিজ্ঞেস করল, কী অনেক কিছু?

টিনা কথায় জবাব দেবার আগেই কিটির মোবাইল বেজে উঠল, মিস্টার বুধিয়ার ফোন!

উত্তেজিতবাবেই ফোনটা রিসিভ করল কিটি। তারপর ওপাশের কথা শুনে বলল, তাই নাকি? মিলেছে? আর ওটা মেলেনি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ও ব্যাপারটা এইমাত্র নেটের একটা সাইটে দেখলাম। কী আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না? প্রকৃতির কী বিচিত্র খেলায়!

এরপর টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে মিনিট পাঁচেক ধরে মিস্টার বুধিয়া কী বললেন তা বুঝতে পারল না টিনা। কিটি কথা বলা শেষ করার পর টিনা তাকে জিজ্ঞেস করল, কি মিলেছে? কি মেলেনি?

কিটি উত্তেজিতভাবে প্রথমে বলল, বিষ! মনসার দেহে যা মিলেছে তা হল ন্যাট্রিক্সের বিষ! তবে রহস্য কিন্তু এখনও যায়নি, বরং আর কিছুটা ঘনীভূত হয়েছে। মিস্টার বুধিয়ার অনুমান ছিল যে সঞ্জীবনবাবুকে যে সাপ কামড়েছে সেটা কেউটে বা কালাজ হবে। কিন্তু কেউটে বা কালাজের যে স্যাম্পেল সঞ্জীবনবাবুর ল্যাবরেটরি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তার সঙ্গে তার দেহে পাওয়া বিষ মিলেছে না। তা ছাড়া কেউটে বা কালাজের বিষের সঙ্গেও নাকি এ বিষের পার্থক্য আছে। তাহলে কি অন্য কোনো সাপ আছে সঞ্জীবনবাবুর ল্যাবরেটরিতে? আরও নতুন কোনো সাপ?

একথা বলার পর কিটি বলল, এবার আসি ন্যাট্রিক্সের প্রসঙ্গে। এই যে ছবিটা তুই ল্যাপটপে দেখছিস এটা ন্যাট্রিক্সেরই ছবি।

মরা সাপ? জানতে চাইল টিনা।

কিটি হেসে জবাব দিল। না মরা সাপ নয়। জ্যান্ত সাপেরই ছবি। প্রকৃতি ন্যাট্রিক্সকে এক অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েছে। আত্মরক্ষা করার জন্য বা শিকার ধরার জন্য অথবা উত্তেজিত হলে ন্যাট্রিক্স এক অদ্ভুত কাণ্ড করে। মাথার পেশির সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে সে তার মাথাটাকে এমন এক অদ্ভুত আকার দেয় যে দেখে মনে হয় তার মাথাটা থেঁতলে গেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত বার করে সে নিশ্চলভাবে পড়ে থাকে, তাকে তখন দেখলে মনে হবে সে মৃত সাপ! তার এই ছদ্মবেশ দেখে কোনো প্রাণী তার কাছে গেলেই তৎক্ষণাৎ তাকে আক্রমণ করে! মনসার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সম্ভবত তাই হয়েছিল। সাপটাকে মৃত ভেবে মনসা তাকে ধরতেই সাপটা তাকে ছোবল মারে। এখন প্রশ্ন হল, কার নির্দেশে মনসা ওই মরা সাপটাকে ফেলতে গেছিল? আর তারপর সেই সাপটাকে আবার বাস্কে পুরলই-বা কে? নিরুপম, নাকি

স্বয়ং সঞ্জীবনবাবু নাকি তৃতীয় কেউ? এ ব্যাপারটায় নিশ্চিত হবার জন্য আমাকে একবার অঞ্জনাদেবীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে এটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট, না, খুন? কাল ভোরে উঠে প্রথমে মিস্টার বুধিয়ার অপিসে যাব। ফার্ম থেকে রাতেই আজ বাড়ি ফিরছেন তিনি। তাঁকে তাঁর অপিস থেকে তুলে নিয়ে রওনা হব সাপের বাসায়।

টিনা বলল, কিন্তু সাপটাকে ওই অবস্থায় রাখা হল কীভাবে? সাপটা ছদ্মবেশ ধরবে কি না সেটা তো তার মর্জির ওপর নির্ভর করে, তাই না?

কিটি জবাব দিল, হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু ধর সাপটাকে আঘাত করা হল, অর্থাৎ উত্তেজিত করা হল! তখনও সে একই কাণ্ড করে। আতঙ্কিত হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ওভাবে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে থাকে। এমন হতে পারে তার কিছুক্ষণ আগেই সাপটাকে আঘাত করা হয়। তারপর ওখানে রাখা হয়। এটা তো হতেই পারে।

টিনা এরপর জানতে চাইল, আচ্ছা, যদি মনসার ব্যাপারটা খুনই হয়, তবে তাকে খুন করে কী লাভ?

কিটি বলল, যে প্রধান তিনটে কারণে মানুষকে সাধারণত খুন করা হয় তা হল, অর্থ, প্রতিহিংসা আর কোনো জিনিসের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য। প্রথমটা সম্ভবত মনসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। দ্বিতীয়টা না তৃতীয় ব্যাপারটার জন্য তার এই পরিণতি হল, সেটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

টিনা শুনে বলল, প্রথমটা কেন নয়?

কিটি বলল, কারণ, খুন হবার মতো অর্থ-সম্পদ আছে বলে মনে হয় না। তাহলে সে লোকের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করত না। হ্যাঁ, একটা জিনিস তার অবশ্যই ছিল। ভরা যৌবন, সেটাকে অবশ্য তুই সম্পদ বলতে পারিস।

টিনা বলল, না, আমি সে-সম্পদের কথা বলছি না। কাশীনাথবাবু যে মণির কথা বলছিল সেটা সাপের মাথার মণি না হলেও অন্য কোনো মণিও হতে পারে। নীলকর সাহেবদের আমলের বাড়ি। এমনও তো হতে পারে সত্যি কোনো গুপ্তধন বা কোনো দামি রত্ন লুকানো ছিল ওই ভাঙা বাড়িতে। মনসা সেটা পায়। আর সেটা তার থেকে নেবার জন্যই খুন হতে হল তাকে। কাশীনাথ চক্রবর্তী তো নিজেই বললেন, যে মণিটা তিনি খুঁজে পেয়েছেন। আমার কিন্তু প্রথম থেকেই ও লোকটাকে কেমন সন্দেহ হচ্ছে!

কিটি বলল, কাশীনাথবাবুর কিছু কথার মধ্যে হেঁয়ালি আছে তা আমারও মনে হয়। তবে এত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ন্যাট্রিক্স দিয়ে তিনি মানুষ খুন করতে পারবেন বলে মনে হয় না। যদিও তিনি এক সময় স্নেক ফার্মের কাজে যুক্ত ছিলেন, হয়তো-বা সাপ ধরতে তিনিও জানেন। কিন্তু মনসা থেকে শুরু করে নীলকণ্ঠবাবু, নিরুপম এমনকী সঞ্জীবনবাবু পর্যন্ত সবাই কিন্তু কাশীনাথবাবুর সম্পর্কে একটা কথাই বলেছেন—তিনি পাগল। একজন পাগলের পক্ষে কি এত কৌশলে অন্য কাউকে খুন করা সম্ভব! এ অন্য কেউ, অন্য কেউ...।

টিনা এরপর তার কথা শুনে বলল, আচ্ছা, সঞ্জীবনবাবুর ওপর তো ড্রয়ারে ন্যাট্রিক্স রেখে একটা অ্যাটেম্পট নেওয়া হয়েছিল। বুধিয়া তো বললেন, সঞ্জীবনবাবুর দেহে যে বিষ পাওয়া গেছে তা পরিচিত সাপের বিষের সঙ্গে মিলছে না। আমরা ধরেই নিতে পারি এটা ছিল তাকে খুন করার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। ভাগ্যক্রমে তাঁর প্রাণটা কোনোমতে রক্ষা পেয়েছে।

কিটি বলল, হ্যাঁ, এই পয়েন্টে তুই কারেক্ট বলেই মনে হয়। কে, কেন সঞ্জীবনবাবুকে খুনের চেষ্টা করল তা খুঁজে বার করতে পারলেই মনসার খুনের পিছনে মোটিভটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে বলেই আমার ধারণা। একথাগুলো বলে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে গভীরভাবে কী যেন ভাবতে শুরু করল কিটি। টিনা তাকে কী আর একটা কথা যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিটি তাকে ইশারায় বুঝিয়ে দিল সে আর এখন কোনো কথা বলতে রাজি নয়। কিটিকে নিজের মতো ভাবতে দিয়ে টিনা প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকল, তারপর সেখানকার কাজ মিটে গেলে ঘরে ঢুকে দেখল আবার ল্যাপটপে মুখ গুঁজে বসে পড়েছে কিটি। টিনা সময় কাটাবার জন্য একটা বই নিয়ে বসল। বাইরে আবার ঝামঝাম শব্দে বৃষ্টি শুরু হল।

রাত দশটা নাগাদ টিনা যখন বইটা রাখল, তখনও কিটির চোখ ল্যাপটপে। তার আঙুলগুলো ধীরে ধীরে খেলা করে চলেছে কী-প্যাডে। টিনা রান্নাঘরে ঢুকল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গরম গরম খিচুড়ি আর ডিমভাজা নিয়ে ঘরে ফিরে এসে কিটিকে বলল, খেয়ে নে। কিটি কোনো জবাব দিল না। কিটির খাবারটা টেবিলে রেখে টিনা খেতে শুরু করল। টিনার খাওয়া শেষ হয়ে গেল এক সময়। টেবিলে প্লেটে রাখা কিটির খিচুড়ি আর ডিমভাজা তখন জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। টিনা তার উদ্দেশ্যে বলল, কী রে, তুই খাবি না?

কিটি বলল, সঞ্জীবনবাবুকে যে সাপটা কামড়েছিল সেটা জানা একান্ত জরুরি। এখন আমাকে বিরক্ত করিস না। চুপ কর। আমার যখন খিদে পাবে তখন খাব।

টিনা মৃদু আহত হল কিটির ধমক শুনে। সে বলল, তাহলে তুই সারারাত জেগে সাপের বিষ, ব্যাঙের বিষ এসব নিয়ে গবেষণা কর। আমার খাওয়া হয়ে গেছে। আমি ঘুমিয়ে পড়ছি। যা ইচ্ছা করগে।

টিনাও একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল।

টিনার কথা শুনে কিটি ল্যাপটপ থেকে চোখ তুলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল টিনার দিকে। তারপর আবার ল্যাপটপে মনোনিবেশ করল। মৃদু গজগজ করতে করতে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুয়ে পড়ল টিনা।

সকাল সাতটা নাগাদ কিটির ডাকে ঘুম ভাঙল টিনার। কিটি তাকে প্রথমে বলল, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। সাড়ে আটটার সময় মিস্টার বুধিয়াকে তাঁর অফিস থেকে তুলতে হবে। সেখানে যাবার পথে রাস্তায় খাবারও কিনতে হবে। কুইক, কুইক! টিনা বিছানায় উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, কাল শুলি কখন?

কিটি এরপর বলল, তুই শুয়ে পড়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। খিচুড়িটা ঠান্ডা হয়ে গেলেও জব্বর বানিয়েছিলি তুই! কিটির চোখে-মুখে মৃদু খুশির ঝিলিক।

দুজনে তৈরি হয়ে নিয়ে আটটার আগেই তারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে একবার থেমে নির্দিষ্ট সময়ই তারা পৌঁছে গেল মিস্টার বুধিয়ার অপিসের সামনে। তিনি নীচেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিটি তাঁকে বলল, আজ আপনার গাড়িটা নিতে হবে না। আপনি আমারটাতেই উঠে আসুন।

বুধিয়া বললেন, ওকে ম্যাডাম।

টিনা তাদের ছোট গাড়িটার পিছনের সিটে গিয়ে বসল, আর মিস্টার বুধিয়া উঠে বসলেন কিটির পাশে। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল কিটি। নীলগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল তিনজন। ড্রাইভ করতে করতে মাঝেমধ্যে গুনগুন করে গান গাইছে কিটি। টিনা বুঝতে পারল আজ বেশ খোশ মেজাজেই আছে কিটি। গাড়ি যখন কলকাতা পেরিয়ে বারাসতের রাস্তা ধরল তখন কিটি একবার মিস্টার বুধিয়াকে জিজ্ঞেস করল, সঞ্জীবনবাবুকে যে সাপ কামড়েছিল তার বিষ যে পরিচিত কোনো সাপের নয়, সে-ব্যাপারে আপনি কনফার্মড?

মিস্টার বুধিয়া বললেন, হ্যাঁ, কনফার্মড। ওটা কেউটে, কালাজ বা অন্য কোনো পরিচিত সাপের নয়, সে-ব্যাপারে আমি এক-শো শতাংশ নিশ্চিত। ওর প্রোটিন কম্পোজিশন অন্যরকম। আমার ফার্ম হাউসে কেউটে আছে। আর এক সময় কালাজ নিয়েও দীর্ঘসময় ধরে কাজ করেছি।

তার কথা শোনার পর কিটি বলল, সাপ ছাড়া তো আপনার ফার্ম হাউসে অন্য ধরনের আরও কিছু প্রাণী আছে, তাই না? যাদের বায়োভেনাম আছে?

তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আরও বেশ কয়েক ধরনের প্রাণী যেমন কয়েক প্রজাতির পোকা, মাকড়সা, কাঁকড়াবিছে। জানেন উইডো স্পাইডার বলে আমার কাছে এক ধরনের মাকড়সা আছে। ওদের পেটটা সিঁদুরের মতো লাল হয়। ওর কামড় সাপের মতোই প্রাণঘাতক!

আর এ ধরনের বিষাক্ত কোনো প্রাণী?

মিস্টার বুধিয়া জবাব দিলেন, না, আর কোনো প্রাণী নেই। সাধারণত বায়োভেনাম সাপ ছাড়া পোকামাকড়দের মধ্যেই বেশি দেখা যায়।

কিটি হেসে বলল, একদিন আপনার ফার্ম হাউসটা দেখার ইচ্ছা রইল।

এগারোটার মধ্যেই সাপের বাসায় পৌঁছে গেল কিটিরা। কম্পাউন্ডের ভিতরে ঢুকে তারা গাড়ি থেকে নামতেই তাদের দেখে এগিয়ে এসে নিরুপম উৎকণ্ঠিতভাবে বলল, স্যারের কোনো খবর আছে নাকি? আমি কাল বিকালে হাসপাতালে গিয়েছিলাম, তখন তো তিনি ওই একইরকম ছিলেন।

তার কথার জবাবে মিস্টার বুধিয়া বললেন, ওনাকে তুমি যেমন দেখে এসেছ, উনি তেমনই আছেন। আমি আজ ভোরে হাসপাতাল থেকে খবর নিয়েছি।

নিরুপম যেন মৃদু আশ্বস্ত হল বুধিয়ার জবাব শুনে। কিটি এরপর নিরুপমকে বলল, আপনাকে মিস্টার বুধিয়াকে সাপের ঘরটা একটু দেখাতে হবে। তারপর সে বুধিয়ার উদ্দেশ্যে বলল, আপনি গুঁর সঙ্গে সাপের ঘরে গিয়ে দেখুন যে নতুন কিছু সন্ধান পান কি না। প্রত্যেকটা বাস্তু খুলে দেখবেন। আমরা ওপর থেকে কাজ করে নীচে নামছি।

বাড়ির ভিতর ঢুকে নিরুপমের সঙ্গে সাপের ঘরের দিকে এগোলেন মিস্টার বুধিয়া। আর কিটিরা উঠে এল দোতলায়। কিটি টিনাকে বলল, একবার সঞ্জীবনবাবুর স্ত্রীকে দেখে আসি। তারপর অঞ্জনাদেবীর ঘরে ঢুকব। ওনাকে কিছু প্রশ্ন করার আছে।

রুবিদেবীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল কিটিরা। দরজার পাশে একটু ফাঁক করাই ছিল। ঘরের ভিতর তারা দেখতে পেল কাশীনাথ চক্রবর্তীকে। খাটে শুয়ে আছেন রুবিদেবী। আর খাটে বসে তাঁর মাথায় হাত বোলাচ্ছেন কাশীনাথবাবু। এ ব্যাপারটার মধ্যে অবশ্য খারাপ কিছু নেই। কাশীনাথবাবু রুবিদেবীর বাবার বয়সি হবেন। পরম মমতায় তিনি হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তার কপালে। দরজায় একটু শব্দ করে ঘরের ভিতর পা রাখল কিটিরা। শব্দ শুনে আর কিটিদের দেখে প্রথমে একটু যেন চমকে উঠলেন বৃদ্ধ। তারপর খাটের পাশ থেকে তার লাঠিটা তুলে নিয়ে কিটিদের উদ্দেশে বললেন, বেরোও, বেরোও ঘর থেকে। তোমরা সঞ্জীবনের লোক। মণিটা তোমরা চুরি করতে এসেছ।

কিটি তাঁকে ভূক্ষেপ না করে খাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রুবিদেবীর চোখ খোলা। আগের দিনের মতোই শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সিলিং-এর দিকে। যেন কিটির উপস্থিতি টেরই পাচ্ছেন না তিনি। লাঠিটা উঁচিয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়ালেন কাশীনাথ চক্রবর্তী। তাঁকে পান্তা না দিয়ে রুবিদেবীর মাথায়, উন্মুক্ত বাহুতে হাত বোলাল কিটি। কী খসখসে রুবিদেবীর ত্বক। কিটির মনে হল সে যেন সিরিশ কাগজে হাত বোলাচ্ছে। কিন্তু কিটির স্পর্শে রুবিদেবীর কোনো ভাবান্তর হল না। তাঁর গায়ে-মাথায় হাত বোলাবার পর কিটি কাশীনাথবাবুর উদ্দেশে বললেন, আপনার ভয় নেই, আপনার মণি আমরা চুরি করতে আসিনি। ‘রুবিও’ তো একটা মণি, তাই না? কিটির ঠোঁটে আবছা হাসির রেশ। টিনাও বেশ অবাক হয়ে গেল কিটির কথা শুনে। সত্যিই তো রুবি মানে চুনি। চুনি একটা মণি! কিটির কথা শোনার পর বৃদ্ধর মুখটা যেন ধীরে ধীরে অন্যরকম হয়ে গেল। হাত থেকে লাঠিটা মাটিতে নেমে এল। ঘষা কাচের আড়াল থেকে ফ্যালফ্যাল করে তিনি তাকিয়ে রইলেন কিটির দিকে। তাঁর সঙ্গে আর কোনো কথা না বলে এরপর সে-ঘর থেকে বাইরে এসে কিটিরা গিয়ে দাঁড়াল অঞ্জনাদেবীর ঘরের সামনে।

দরজায় টোকা দিতে অঞ্জনাদেবীই দরজা খুললেন। চিন্তাক্রিষ্ট মুখ। দরজা খুলে কিটিদের দেখে বেশ একটু অসন্তুষ্টভাবেই তিনি বললেন, আপনারা? কী ব্যাপার?

কিটি বলল, আপনার কাছে আমার কয়েকটা প্রশ্ন ছিল। বেশি সময় নেব না। ভিতরে আসতে পারি?



কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিয়ে অঞ্জনাদেবী বললেন, আসুন।

ঘরে ঢুকেই কিটি জানতে চাইল, অরিত্র নেই?

তিনি জবাব দিলেন, না, নেই। ওকে আমি একটা কাজে পাঠিয়েছি।

কী কাজ জানতে পারি কি?

অঞ্জনাদেবী জবাব দিলেন, সকাল বেলা ডাক্তার এসেছিল সঞ্জীবনের স্ত্রীকে দেখতে। নিরুপমই ডেকে এনেছিল। তিনি ওষুধ লিখে দিয়েছেন, সেটাই আনতে পাঠিয়েছি। তা ছাড়া আমরা এ জায়গা থেকে নিজেদের জায়গাতে ফিরে যেতে চাই ক-দিনের মধ্যে। ট্রেনের খবরাখবরও জানতে বলেছি। তা এ প্রশ্ন দুটোই কি আপনাদের করার ছিল?

কিটি বলল, না, আমি অন্য কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি। প্রথম প্রশ্ন হল, আপনার স্বামী মারা যান ঠিক কীভাবে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি জবাব দিলেন, সাপের কামড়ে। একটা মরা সাপ ফেলতে গেছিলেন তিনি। তারপর সাপের কামড়ে মারা যান। ঠিক যেভাবে মরা সাপ ফেলতে গিয়ে মনসা মারা গেল। মৃদু কৈঁপে উঠল অঞ্জনাদেবীর গলা।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—আপনার স্বামী যেদিন মারা যান, সেদিন কি আপনাদের ফার্ম হাউসে সঞ্জীবনবাবু উপস্থিত ছিলেন?

অঞ্জনাদেবী উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ছিলেন। সে-ই আমার স্বামীকে এসে খবরটা দেয় যে একটা কেউটে মারা গেছে। আমার স্বামী যেন সাপটাকে ফেলে দেন।

তঁার কণ্ঠস্বর এবার স্পষ্ট কৈঁপে উঠল।

আপনারা সেই সাপটাকে দেখেছিলেন?

হ্যাঁ, দেখেছিলাম। সেটা মরা কেউটেই ছিল। আমার স্বামীর অচৈতন্য দেহের পাশেই সেটা পড়ে ছিল।

তাকে সাপে কাটার পর অ্যান্টিভেনাম পুশ করা হয়েছিল?

হ্যাঁ, হয়েছিল। কিন্তু তা কাজ দেয়নি।

কিটি তাঁর জবাব শুনে চুপ করে তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, এবার আমি শেষ প্রশ্ন করব। আপনি নিজের জায়গা ছেড়ে সঞ্জীবনবাবুর সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিলেন কেন?

এ প্রশ্ন শুনে কিটি আর টিনাকে চমকে দিয়ে তিনি আত্ননাদ করে বলে উঠলেন, বিশ্বাস করে! বিশ্বাস করে! আমাদের ফার্মে কাজ করত ও। ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম আমি। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর আমার দায়িত্ব নেবে, ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ে দেবে বলে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল সঞ্জীবন। ওকে আমি আমার সর্বস্ব দিয়েছিলাম, একজন নারী যা দিতে পারে। কিন্তু তার পরিবর্তে ও অরিত্রকে সাপের বিষের নেশা ধরাল, আমাকে সে ক-দিন ধরে চাপ দিচ্ছিল আমাদের ফার্মটা ওর নামে লিখে দেবার জন্য। কিন্তু মনসার ঘটনায় আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, সঞ্জীবনই আমার স্বামীকে খুন করেছিল টাকার লোভে, শরীরের লোভে...। কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অঞ্জনা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অঞ্জনাদেবীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল কিটিরা। বিস্মিত টিনা বলল, শেষ পর্যন্ত সঞ্জীবনবাবু নিজেই...।

কিটি নীচে নামতে নামতে জবাব দিল, সঞ্জীবনবাবুর সঙ্গে অঞ্জনাদেবীর যে অন্যরকম সম্পর্ক আছে তা আমি পরে আন্দাজ করেছিলাম। মনসা শঙ্খলাগা দেখেছিল ভাঙাবাড়িতে। নারী বলতে এ বাড়িতে সে ছাড়া আর দুজন ছিল। রুবিদেবী আর অঞ্জনাদেবী। পুরুষ বলতে সঞ্জীবন আর নিরুপমা। নিরুপম নিশ্চয়ই রুবিদেবীর সঙ্গে মিলিত হবেন না। বয়সের ফারাক আছে, আর তার সঙ্গে তাঁর চেহারাটাও...। আর সঞ্জীবনবাবু নিশ্চয়ই নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বাড়ির ভাঙা অংশে যাবেন না, কাজেই...।

টিনা জিজ্ঞেস করল, তবে কি মনসা ব্যাপারটা জেনে ফেলাতেই তাকে খুন হতে হল!

কিটি জবাব দিল, এটা একটা কারণ হতে পারে ঠিকই। কিন্তু আমার ধারণা তাকে খুন করার পিছনে আরও গূঢ় কোনো কারণ লুকিয়ে আছে।

নীচে নেমে কিটিরা সোজা এগোল সাপের ঘরের দিকে।

মিস্টার বুধিয়া আর নিরুপম ঘরের ভিতরই ছিল। কিটিরা ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন ২৪টা বাস্ক আছে ঘরে। সবকটাই খুলে দেখলাম। অপরিচিত অন্য কোনো সাপ নেই ঘরে। আপনি নিজেও দেখতে পারেন।

কিটি বলল, দরকার নেই। আমারও মন বলছিল তেমন কিছু পাওয়া যাবে না, অন্য একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য ব্যাপারটা দেখতে বলেছিলাম।

আচ্ছা নিরুপমবাবু, ওই ন্যাট্রিক্স সাপটাকে সঞ্জীবনবাবু কবে এনেছিলেন খেয়াল আছে?

নিরুপম জবাব দিল, অঞ্জনাদেবীরা এখানে আসার পরপরই কোনো একদিন তিনি সাপটাকে দেখান আমাকে! ওই সময়েই তিনি এনেছিলেন।

মিস্টার বুধিয়া প্রথমে এরপর কিটিদের বললেন, ন্যাট্রিক্সের অদ্ভুত আচরণটা এবার হাতেকলমে দেখার চেষ্টা করি আমরা। তারপর নিরুপমের উদ্দেশে বললেন, ভয় পেয়ো না, সাপ নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমি তোমার স্যারের থেকে ভালোই জানি।

টেবিলের ওপর মিস্টার বুধিয়া ন্যাট্রিক্সের বাস্কট ন্যামিয়ে এনেছেন। তার পাশে রাখা আছে স্নেক হুক, আর সাপ ধরার একটা সাঁড়াশি। বাস্কট খুললেন মিস্টার বুধিয়া, তারপর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি সাপটাকে বাইরে বার করে আনলেন। কী কুৎসিত দেখতে প্রাণীটা! ক্রুরতা মেশানো দৃষ্টি। স্নেক স্টিকে আটকে থাকা অবস্থায় চারপাশে মাথা নাড়াতে নাড়াতে সে জিভটাকে বাতাসে ছুড়ে দিচ্ছে। এই সাপটাই দু-দুটো মানুষের প্রাণ নিয়েছে! সাপটাকে দেখে টিনার শরীর শিরশির করে উঠল।

সাপটাকে ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর ন্যামিয়ে সাপ ধরার সাঁড়াশি দিয়ে তাকে টেবিলের সঙ্গে চেপে ধরতেই সাপটা মুক্তি পাবার জন্য ছটফট শুরু করল। মিস্টার বুধিয়া এরপর অন্য হাত দিয়ে স্নেক স্টিকটা ঠুকতে লাগলেন সাপটার মাথার কাছে টেবিলের ওপর। অমনি সাপটা স্টিকটাকে ছোবল দেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কী ফোঁসফোঁস গর্জন তার। মিস্টার বুধিয়া তার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। মিনিট তিনেক পরই হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। সাপটার গলা আর মাথা কেমন যেন দুমড়ে-মুচড়ে গেল। সাপটার মুখ আর নাক দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল রক্ত। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল তার মাথা। তারপর নিখর হয়ে গেল সাপটা। যেন কেউ খেঁতলে মেরেছে সাপটাকে! মিস্টার বুধিয়া মন্তব্য করলেন, ক্যামুফ্লেজ! প্রকৃতি যে প্রাণীদের ভিতর কত আশ্চর্য ব্যাপার লুকিয়ে রাখে তার হিসাব নেই!

কিটি বলল, হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালের কোনো তুলনা নেই। আপনারা এখানেই বাড়িতে থাকবেন, আমি একটু ঘুরে আসছি। সম্ভবত এখানকার কাজ আমাদের শেষ।

মিস্টার বুধিয়া বললেন, কোথায় যাচ্ছেন জানতে পারি?

কিটি জবাব দিল, কাছেই নীলকণ্ঠবানুর বাড়ি। আসলে আমাদের অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন সঞ্জীবনবাবু। তাঁর যা অবস্থা তাতে আমাদের আর কোনোদিনই জানা সম্ভব হবে না যে তিনি আর ইনভেস্টিগেশন করতে আগ্রহী কি না। আমি প্রফেশনাল ইনভেস্টিগেটর। পয়সা না পেলে তো কাজ করব না। এ কেসের এখানেই ইতি। পুলিশ যদি কোনো তদন্ত করে, করবে। আমরা আর এখানে আসব না। যাবার আগে সবার সঙ্গে দেখা করে যাব। তাই গুঁর ওখানে যাচ্ছি। ক-টা ব্যক্তিগত কথাও অবশ্য আছে তাঁর সঙ্গে।

মিস্টার বুধিয়া বললেন, ঠিক আছে, আমি এ বাড়িতেই আছি।

সাপের ঘর থেকে এরপর বেরিয়ে এল কিটিরা। তারপর বাড়ির বাইরে এসে বাগান, ভাঙা ঘরগুলোর পাশ দিয়ে পিছনের মাঠে এসে আল ধরে এগোল নীলকণ্ঠবাবুর বাড়ির দিকে। যেতে যেতে টিনা প্রশ্ন করল, আচ্ছা সঞ্জীবনবাবু যদি সত্যিই ন্যাট্রিক্স দিয়ে মনসাকে খুন করে থাকেন, তাহলে আমাদের অ্যাপয়েন্ট করলেন কেন?

কিটি এগোতে এগোতে জবাব দিল, খুনিদের সাইকোলজি বড়ো বিচিত্র। যিনি গোয়েন্দা নিয়োগ করেছেন তিনিই খুন করাচ্ছেন এ ব্যাপারে চট করে কেউ সন্দেহ করবে না। সম্ভবত এ ধারণা থেকেই আমাদের তিনি ডাকিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত শিকারি নিজেই শিকার হয়ে গেল! আমাদের এখানে আনার জন্যই সম্ভবত ড্রয়ারে সাপ রাখার গল্পটা ফেঁদেছিলেন তিনি।

টিনা জিজ্ঞেস করল, কিন্তু তাঁকে কামড়াল কোন সাপে! নতুন সাপ তো পাওয়া গেল না। তার প্রশ্নের জবাব দিল না কিটি। আকাশে আবার মেঘ জমতে শুরু করেছে। বৃষ্টি নামবে বোধ হয়।

॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠবাবুর বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেল কিটিরা। নিবুম বাড়িটা। চারপাশে ঝোপ-গাছপালা আর আকাশে মেঘের জন্য কেমন যেন অদ্ভুত ছায়াময় লাগছে বাড়িটা। বাড়ির পিছন থেকে গ্যাঙরগ্যাঙ, গ্যাঙরগ্যাঙ শব্দ শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত আকাশে মেঘ দেখে ভেককুল উল্লসিত হয়ে উঠেছে। কিটি একবার

নিজের মনেই বলল, সাপের বাড়ি ব্যাঙের বাসা কোলাব্যাঙের ছা।/খায় দায় গান গায় তাইরে নাইরে না।

টিনা হেসে ফেলল তার ছড়া শুনে। কিটি এরপর হাঁক দিল, নীলকণ্ঠবাবু আছেন নাকি?

বারকয়েক তাকে ডাকার পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তিনি। কিটিদের দেখে বেশ উৎকণ্ঠিতভাবে তিনি জানতে চাইলেন, সঞ্জীবনের কোনো খবর আছে নাকি? তার কি কিছু হয়েছে?

কিটি জবাব দিল, বেঁচে গেছেন, তবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কোনোদিন আর হাঁটা-চলা দূরে থাক কথাবার্তাও বলতে পারবেন না। বিছানায় শুয়েই বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

কিটির কথা শুনে আফশোসের সুরে নীলকণ্ঠবাবু বললেন, ওই বাড়িটাতে কী যে হল কে জানে! পরপর দুজনকে সাপে কাটল। সঞ্জীবনের স্ত্রীর অবস্থা এবার কী হবে কে জানে? স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই কে দেখবে কে জানে? আপনারা বাইরে কেন, ভিতরে আসুন।

কিটি জবাব দিল, না ভিতরে যাব না। আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, আমরা চলে যাব। যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আপনার সঙ্গেই তো এখানে আসার পথে প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তাই না? বাড়ির চারপাশের পরিবেশটা বেশ সুন্দর! কেমন শান্ত, নিঝুম। বাড়ির বাইরেটা বরং আমরা ঘুরে দেখি। তা ছাড়া আপনার ব্যাঙের চৌবাচ্চারও একটা ছবি নেব। সাপের ছবির সঙ্গে ব্যাঙের ছবিও ছাপাব। সাপ আর ব্যাং দুটো কথাই তো একসঙ্গে উচ্চারিত হয়।

কিটির কথা শুনে নীলকণ্ঠবাবুর বিষণ্ণ মুখ যেন মৃদু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ব্যাঙের ছবি সত্যি ছাপাবেন আপনারা? আমার নামটাও তবে ছাপাবেন। জানেন, এই ব্যাং ধরে পেট চালাই বলে কত বিদ্রূপ করে লোকজন। সেদিন তো একটা ঘটনা নিজের চোখেই দেখলেন। কাগজে আমার নাম, ছবি ছাপা হলে কেউ আর আমাকে বিদ্রূপ করবে না। সঞ্জীবনের মতোই সম্মান পাব আমি।

কিটি হেসে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ছাপাব। আপনি চলুন। বৃষ্টি নামলে ছবি তোলা যাবে না।

নীলকণ্ঠবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, চলুন, চলুন।

বাড়ির পিছনে যেতে যেতে কিটি বলল, আপনি তো পেরু গেছিলেন, তাই না? অ্যানাকোন্ডার সঙ্গে আপনার ওই ছবিটা আমরা নেব।

নীলকণ্ঠ বললেন, হ্যাঁ, ওই ছবিটা বেশ ভালো হবে কাগজে ছাপার জন্য। আমাজনের একটা অংশে সাপের সন্ধানে সঞ্জীবনের সঙ্গে ঘুরেছি আমি। অদ্ভুত পরিবেশ! নানা ধরনের গাছপালা। বিচিত্র প্রাণী আছে ওখানে।

কিটিরা এসে দাঁড়াল বাড়ির পিছনের অংশে একটা চৌবাচ্চার সামনে। চারপাশে অবিশ্রান্ত ব্যাঙের কলরব। চৌবাচ্চার ভিতর লাফালাফি করছে ব্যাংগুলো। নীলকণ্ঠবাবু বললেন, বৃষ্টি আসছে তো তাই ওদের এত আনন্দ!

কিটি ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বার করে বলল, জালটা ওপরে ওঠান। ছবি নেব।

নীলকণ্ঠবাবু জালটা ওঠালেন। ক্যামেরাটা সেট করতে করতে চৌবাচ্চাটা দেখে খুশিতে যেন ভরে উঠল কিটির মন। কত ব্যাং আনন্দে ছপছপ করে লাফাচ্ছে চৌবাচ্চাতে। ব্যাং জিনিসটাও যে দেখতে কম সুন্দর নয় তা এই প্রথম উপলব্ধি করল কিটিরা।

বেশ ক-টা ছবি নিল কিটি। তারপর নীলকণ্ঠবাবুকে বলল, আমাকে একটা ব্যাং দেবেন, অ্যাকোয়ারিয়ামে রাখব।

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেব না কেন? দাঁড়ান, আপনাকে আমার সংগ্রহের সবচেয়ে ভালো ব্যাং দিচ্ছি। সবুজ রঙের একটা গেছো ব্যাং। অ্যাকোয়ারিয়ামে দারুণ মানাবে। ওটা বিক্রি না করে নিজের সংগ্রহে রেখে ছিলাম। আপনাকে উপহার দেব।

কিটি হেসে বলল, না, ব্যাংটা আমি পছন্দ করব। ওই যে চৌবাচ্চার কোনায় চুপচাপ বসে আছে মাঝারি আকারের ব্যাংটা। হলুদ পিঠে কালো ডোরা? ওটাই আমি নেব।

নীলকণ্ঠবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ওটা অসুস্থ। দু-একদিনের মধ্যেই মারা যাবে। দেখছেন না, অন্য ব্যাংগুলোর সঙ্গে খেলা না করে ও কেন চুপচাপ ঝিমোচ্ছে। আমি আপনাকে অন্য ব্যাং দিচ্ছি।

কিটি জবাব দিল, কিন্তু আমি যে ওই ব্যাংটাই খুঁজতে আপনার কাছে এসেছি নীলকণ্ঠবাবু। ও ব্যাংটাই যে আমার চাই। কিটির গলাটা এবার যেন একটু কঠোর শোনা।

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, আপনি ওই ব্যাংটা খুঁজতে এসেছেন মানে! ওটাই চাই কেন?

কিটি জবাব দিল, কারণ, ওটাই আমার লাগবে। ও ব্যাঙ্কের নাম আমি জানি। ‘থ্রি স্ট্রাইপড ফ্রগ’। লাতিন আমেরিকাতে আমাজন অববাহিকায় পাওয়া যায়। আপনি তো এ ব্যাংটা ওদেশ থেকেই এনেছেন, তাই না?

কিটির কথা শুনে নীলকণ্ঠবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, হ্যাঁ, আপনার কথা সত্যি। ওটা আমার রেয়ার কালেকশন। ও-রকম দেখতে ব্যাং এখানে দেখা যায় না। তাই ওটা দেব না।

কিটি বলল, হ্যাঁ, রেয়ার কালেকশন সত্যিই। ওর পুরো নাম ‘থ্রি আইপড পয়জন ফ্রগ’। মারাত্মক বিষাক্ত ব্যাং। এদের দেহে তীব্র বিষ আছে। আমাজনের আদিম অধিবাসীরা ওর পিঠের গুটিতে ব্লো পাইপের কাঁটা ঢুকিয়ে সে-কাঁটা বিষাক্ত করে নেয়। সে-কাঁটা গায়ে ফুটলে স্নায়ুতন্ত্র অকেজো হয়ে যায়। বেশি পরিমাণে সে-বিষ গায়ে ঢুকলে মৃত্যু নিশ্চিত।

নীলকণ্ঠবাবুর মুখটা যেন ঝুলে পড়েছে। বিস্মিত কণ্ঠে তিনি বলল, আপনারা কারা? পুলিশের লোক?

কিটি তার ভিজিটিং কার্ডটা নীলকণ্ঠবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ব্যাংটা আমরা ধার হিসাবে নেব। আমার ধারণা ওর বিষের সঙ্গে সঞ্জীবনবাবুর রক্তে পাওয়া বিষের স্যাম্পেলটা মিলে যাবে। আপনি ধরা পড়ে গেছেন নীলকণ্ঠবাবু।

কিটির কথা শুনে নীলকণ্ঠবাবু আত্ননাদ করে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিই সঞ্জীবনের দেহে ওই বিষ দিয়েছি। ও অনিরুদ্ধ মোহন্তকে খুন করেছে, মনসাকেও খুন করল, ওর দেহে ওই বিষ না দিলে রুবিকে বাঁচানো যেত না। হ্যাঁ, আমি মারার চেষ্টা করেছি ওকে। আমাকে কোথায় যেতে হবে বলুন? ভেঙে পড়লেন নীলকণ্ঠবাবু।

কিটি বলল, এখন আপাতত বাড়ির ভিতর চলুন। আপনার থেকে আমার আরও কিছু জানার আছে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে নীলকণ্ঠবাবুর মুখোমুখি বসল কিটিরা। স্পষ্টতই বিধ্বস্ত নীলকণ্ঠবাবু। মাথা চেপে ধরে তিনি বসে আছেন। কিটি তাঁকে জিজ্ঞেস করল রুবিদেবীর চেহারাটা ও-রকম কেন বলতে পারেন? তাঁকে কেন খুন করতেন সঞ্জীবন? মনসাকেই-বা মারলেন কেন?

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, রুবির ওপর এক অদ্ভুত পরীক্ষা চালাচ্ছিল সঞ্জীবন। খুব অল্প পরিমাণে ওর দেহে সাপের বিষ ঢোকাচ্ছিল সে। ঠিক যেভাবে বিল হাস্ট তার দেহে সাপের বিষ ঢুকিয়ে নিজের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়িয়ে তুলেছিল। অন্যর ওপর এ পরীক্ষা আইনের চোখে নিষিদ্ধ। মারা যেতে বসেছিল রুবি। প্রচণ্ড জ্বালা তার শরীরে। মনসা ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল। তা ছাড়া সঞ্জীবনের সঙ্গে একরাতে অঞ্জনার মিলনের দৃশ্যটা সে দেখে ফেলেছিল। সেজন্যই ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিল সঞ্জীবন। রুবিকে মারত কারণ রুবি যদি কাউকে কিছু বলে দেয় সেজন্য। মাঝেমধ্যে ওর সেন্স ফিরে আসে। তখন ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আসলে মাথার গুণ্ডগোলের ব্যাপারটা কিছুটা জেনেটিক। ওটা সে ওর বাবা কাশীনাথ চক্রবর্তীর কাছ থেকে পেয়েছে। টিনা চমকে উঠলেও কিটি শান্তস্বরে বলল, এ ব্যাপারটাও আমি আন্দাজ করেছিলাম। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কি রুবিদেবীর পুরোনো কোনো সম্পর্ক ছিল? নইলে তাকে বাঁচাবার জন্য আপনি মানুষ খুনের রিস্ক নিলেন কেন?

নীলকণ্ঠবাবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, ছিল। এ গ্রামেই দুজনেই একসঙ্গে আমরা বড়ো হয়েছি। আমার সঙ্গেই তার বিয়ে হবার কথা ছিল। কিন্তু দেনার ফাঁদে পড়ে কাশীনাথকাকু সঞ্জীবনের সঙ্গে ওর বিয়ে দিলেন। তবে স্বামীর প্রতি কর্তব্যের কোনো ভ্রুটি ছিল না রুবির। বিবাহ-বহির্ভূত কোনো দেহের সম্পর্ক আমার সঙ্গে ওর ছিল না। ওর জন্যই তো আমি সঞ্জীবনের অনেক অপমান সহ্য করেছি। ব্যাংবাবু নাম নিয়ে লোকের বিদ্ৰূপের পাত্র হয়ে এ গ্রামে রয়ে গেছি...। কথা বলতে বলতে ধরে এল নীলকণ্ঠবাবুর গলা।

টিনা এবার কৌতূহলী হয়ে বলল, আপনি ব্যাঙের বিষটা ওর দেহে ঢোকালেন কীভাবে? ফাউন্টেন পেন দিয়ে? একটা গল্পে ও-রকম একটা ব্যাপার পড়েছিলাম।

নীলকণ্ঠবাবু বললেন, ওটা গল্প। ওভাবে বিষ ঢোকানো গেলেও বিষের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। কাঁটা দিয়েই বিষ ঢুকিয়েছিলাম ওর শরীরে। তবে ‘ব্রো-পাইপ’-এর কাঁটা নয়, মনসার চুলের কাঁটা। যেটা আমি মনসার দেহের পাশ থেকে সেদিন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সঞ্জীবন ঘুমের ওষুধ খেয়ে শোয় আমি



জানতাম। ওর দরজাতে ছিটকানি বা খিল ছিল না। চাবি দিয়ে দু-দিক থেকেই দরজা খোলা-বন্ধ করা যায়। সুযোগ বুঝে একদিন আমি সাবানে চাবির ছাপ তুলে নিয়েছিলাম। তাই দিয়ে চাবি বানিয়ে দরজা খুলি। কাঁটা বসিয়ে বেরোবার সময় অবশ্য দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছিলাম।

কিটি বলল, এবার স্পষ্ট হল ব্যাপারটা। ওইজন্যই সাবানের মোড়ক পাওয়া গেছিল ভাঙা ঘরে।

নীলকণ্ঠবাবু এবার শেষ আর্তনাদ করে বলে উঠলেন, বিশ্বাস করুন, আমার এ ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। রুবিকে বাঁচানো যেত না। আমি তাকে খুব খুব ভালোবাসি। এরপর নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি নেমেছে। তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে রইল কিটিরা।

## ॥ ১১ ॥

তখন বিকাল। সাপের বাসা থেকে বেরিয়ে ফেরার পথ ধরল কিটিরা। বৃষ্টি সবে ধরেছে। চালকের আসনে মিস্টার বুধিয়া। পিছনে কিটিরা। মেঠো পথ ধরে হেলতে দুলতে চলেছে গাড়িটা। দু-পাশে জলাজমি।

টিনাকে কিটি বলল, তোর জন্যই কেসটা সলভ হল। ওই যে কাল রাতে তুই বললি না—তুই সাপের বিষ ব্যাঙের বিষ নিয়ে গবেষণা কর। তোর কথা শুনে মনে পড়ল কোনো একটা বইতে পড়েছিলাম ব্যাঙেরও বিষ আছে। আর তারপর ইন্টারনেট....।

টিনা জিজ্ঞেস করল, ব্যাংবাবুকে তুই ছেড়ে দিলি কেন?

কিটি জবাব দিল, রুবিদেবীকে তিনি খুব ভালোবাসেন। তিনি না থাকলে রুবিদেবী, কাশীনাথবাবু এমনকী সঞ্জীবনের দেখাশোনা করবে কে? যে মানুষটা অন্যের জন্য, ভালোবাসার জন্য নিজেকে বিপদে ফেলতে পারে...।

কিটির কথা শেষ হবার আগেই ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করালেন মিস্টার বুধিয়া। স্কুল ছুটি হয়েছে। সামনে রাস্তায় একদল ছেলে। একজনের পিছনে তারা চাঁচাতে চাঁচাতে যাচ্ছে—ব্যাংবাবু! ব্যাংবাবু! লোকটার পরনে খাকি পোশাক, মাথায় ছাতা। গাড়ির হর্নের শব্দে ছেলেগুলো এদিক-ওদিক ছিটকে

গেল। ছাতা মাথায় লোকটা পিছন ফিরে তাকাল। কিটিদের দিকে তাকিয়ে  
বিষণ্ণভাবে একবার হাসলেন তিনি। তারপর ব্যাং ধরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে  
জল-কাদার ভিতর নেমে গেলেন ব্যাংবাবু ওরফে নীলকণ্ঠ পালিত। সাপের  
বাসা থেকে কিটিরা ফিরে চলল কলকাতার দিকে।

---

## দ্বিতীয় আখ্যান

॥ ১ ॥

কফির মগ তুলে নিয়ে তাতে একটা চুমুক দিয়ে কিটি বলল, ‘যোধপুর পার্ক থেকে একজন টেলিফোন করেছিল। মেল ভয়েস। বয়স খুব একটা বেশি বলে মনে হল না। সাড়ে আটটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইল। এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিবি কিন্তু।’ টিনা কম্পিউটারের কি-বোর্ডে আঙুল চালাতে-চালাতে বলল, ‘কী কেস কিছু বলল? যা আসে তা সবই তো দেখি, হয় স্বামী বা স্ত্রী-র হয়ে অন্যকে ফলো করা, নয় পাত্র-পাত্রীর ফ্যামিলি স্টেটাসের ইনফরমেশন কালেক্ট করা! যন্ত সব বোগাস কেস! কোনো থ্রিল নেই!’

কিটি আর একটা চুমুক দিয়ে বলল, ‘বলল তো খুব আর্জেন্ট দরকার। ব্যাস, এ পর্যন্তই। তা তুই এই সাতসকালে কম্পু খুলে বসলি কেন?’

‘দেখছি কোনো নতুন মেল এল কি না!’ স্ক্রিনের দিকে চোখ রেখে উত্তর দিল টিনা।

‘কার মেল, কোনো বয়ফ্রেন্ডের?’

কিটির কথার মধ্যে যে একটা খোঁচা লুকিয়ে আছে তা ধরতে পারল টিনা। গত দু-মাসে তিনজন ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে ছিল তার। কিন্তু একটাও ম্যাচিয়োর করেনি। তাদের একজন নিজেই কেটে পড়েছে, আর অন্য দুজনকে কাটিয়েছে টিনা নিজেই। টিনা গম্ভীরভাবে বলল, ‘হতে পারে। আমার আলাদা একটা ক্রেজ আছে। তোর মতো আমি তো আর রসকষহীন নই!’

কিটি হেসে ফেলে বলল, ‘ক্রেজ তো হবেই। এমনভাবে টি-শার্টের বোতাম খুলে রাখিস যে ক্লিভেজ পর্যন্ত...’

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে টিনা বলল, ‘সাতসকালে ফালতু বকিস

না। বাথরুমে যা। তোর পর আমি যাব। তোর ক্ল্যামেন্ট তো সাড়ে আটটায় আবার আসবে বললি।’

কিটি কফির মগে একটা শেষ চুমুক দিয়ে সেটা রান্নাঘরে রাখার জন্য সেদিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল, ‘দেখিস, ক্ল্যামেন্টের বয়স কম হলে তুই আবার তার প্রতি...’ কথাটা আর শেষ করল না সে। টিনা একবার চোখ ফিরিয়ে কটমট করে তাকাল তার দিকে, তারপর আবার কম্পুতে মন দিল।

কিটি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুমে ঢুকল। মিনিট দশেক সময় লাগল তার। তারপর ঢুকল টিনা। তার আধঘণ্টা সময় লাগে স্নান সারতে। টিনা বাথরুমে ঢোকার পরই চটপট তাদের ড্রয়িং রুমটা একটু গুছিয়ে নিল কিটি। তারপর রান্নাঘরে ঢুকল ব্রেকফাস্ট বানানোর জন্য। টিনা যখন বাথরুম থেকে বাইরে বের হল, ততক্ষণে ব্রেকফাস্ট রেডি হয়ে গিয়েছে। টিনা সতিাই সুন্দরী। তার উপর শুধু তোয়ালে জড়ানো সদ্য-স্নান-সারা টিনাকে দেখতে প্রায় ফিল্মস্টারদের মতো লাগছে! তাই দেখে কিটি বলল, ‘তোকে যা লাগছে! লিওনার্দো এ সময় তোকে দেখলে মোনালিসা ছেড়ে তোর ছবি আঁকতেন!’

টিনা ওর কথা শুনে হাসল।

ব্রেকফাস্ট সেরে পোশাক বদলে সাড়ে আটটার মধ্যেই ড্রয়িং রুমে একদম রেডি হয়ে বসল ওরা। কিটি খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে হেডলাইনে চোখ বোলানোর পর একটা লাল মার্কার পেন দিয়ে গতকাল শহরে ঘটে যাওয়া ক্রাইম রিপোর্টগুলোতে দাগ দিতে শুরু করল।

মিনিট তিনেক পর তার পাশে বসা টিনা জিজ্ঞেস করল, ‘কী রে, আজ কী কী পেলি?’

কিটি কাগজটা নামিয়ে রেখে বলল, ‘তেমন কিছু নয়। শেয়ালদার কাছে একটা দোকানে একটা ছোট্ট চুরির ঘটনা, ময়দানে একটা ম্যাটিং, আর পার্ক সার্কাসে একজনকে স্লীলতাহানির দায়ে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।’

টিনা তার কথা শুনে কী-একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই ডোর বেল বেজে উঠল। কিটি দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ঠিক সাড়ে আটটা বাজে।

দরজার ল্যাচ খুলে কিটি দেখল, সামনে একটি অল্পবয়সি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স সম্ভবত কিটিদের চেয়ে একটু বেশি, অর্থাৎ বছর আঠাশ

হবে। ফর্সা-লম্বা চেহারা, পরনে ব্লু জিন্স আর গোলাপি টি-শার্ট। মুখটা খুব সুন্দর, সপ্রতিভ চেহারা, কিন্তু একটা দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়ছে তার মুখে।

কিটি দরজা খুলে দাঁড়াবার পর সে বলল, ‘এটা কি ক্যাটারিনা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি?’

কিটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

ছেলেটা বলল, ‘আমি মিস ক্যাটারিনা সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।’

কিটি বলল, ‘আমিই ক্যাটারিনা। ভিতরে আসুন।’ ওকে নিয়ে ড্রয়িং রুমে এসে সোফার মুখোমুখি একটা চেয়ারে তাকে বসাল কিটি। তারপর নিজে টিনার পাশে বসে আগন্তকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, বলুন, আপনাকে আমি কী সাহায্য করতে পারি?’

ছেলেটা বলল, ‘আমার নাম অনিকেত, অনিকেত মিত্র। যোধপুর পার্কে পূর্বাশা হাউজিং কমপ্লেক্সে থাকি। আমি খুব বিপদের মধ্যে আছি, ম্যাম। তাই আপনার কাছে তাই এসেছি।’

‘কী বিপদ?’ পেশাদারি ঢঙে প্রশ্ন করল কিটি। অনিকেত একটু ইতস্তত করল প্রথমে। তারপর বলল, ‘পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করেছিল। দু-দিন পুলিশ কাস্টডিতে ছিলাম। কাল কোর্ট থেকে বেল বন্ডে বাইরে এসেছি।’ বলে মাথা নীচু করল সে।

কিটি জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার বিরুদ্ধে চার্জটা কী?’

সে জবাব দিল, ‘আমি আইনের ধারা-ফারা অত বুঝি না। তবে সম্ভবত অ্যাপ্রিহেনশন অব মার্ডার। ওরা কোর্টে চার্জটা ঠিকভাবে ফ্রেম করতে না পারায় আর আমার হয়ে একজন সিনিয়র অ্যাডভোকেট গ্লিড করায় বেল পেয়েছি। আমাকে রোজ লালবাজারে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কাউকে খুন করিনি।’

ওর কথা শুনে কিটি একটু চমকে উঠে বলল, ‘অ্যাপ্রিহেনশন অব মার্ডার! কে খুন হয়েছে?’ অনিকেত বলল, ‘আমি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। সেক্টর ফাইভে গ্লোবাল প্রসপেক্ট নামে একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করি। গত মঙ্গলবার কোম্পানির সাততলা বিল্ডিং থেকে একটি মেয়ে নীচে

পড়ে মারা যায়। ওর নাম ছিল অ্যানি আলভারেজ। সেও পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিল। পুলিশের ধারণা, আমি তাকে ছাদ থেকে নীচে ফেলে মার্ডার করেছি!’

কিটির পাশ থেকে টিনা এবার বলল, ‘কেন, পুলিশের হঠাৎ এ-রকম ধারণা হল কেন?’

অনিকেত বলল, ‘আমার মোবাইল থেকে কে যেন ওকে ছাদে যাবার জন্য মেসেজ পাঠিয়েছিল। আমিও ওই সময় ছাদে গিয়েছিলাম, লোকে দেখেছে,’ এরপর একটু থেমে সে বলল, ‘তা ছাড়া ডেডবডির হাতে পুলিশ আমার অফিস ব্রেজারের একটা বোতাম পেয়েছে!’

কিটি শুনে বলল, ‘ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন। যা বলবেন, একদম সত্যি বলবেন। ঘটনাটার উল্লেখ আমি খবরের কাগজে দেখেছি।’

কিটির কথা শুনে একটু চুপ করে রইল অনিকেত। তারপর আন্তে আন্তে বলল, ‘আমি এই কোম্পানিতে তিন বছর ধরে চাকরি করি। ছোটো কোম্পানি। মূলত ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ হয়। অরবিন্দ সুরি কোম্পানির মালিক। আমি ছাড়া আরও তিনজন পার্মানেন্টলি কাজ করে সেখানে। সেক্টর ফাইভে কুইন্স ম্যানসন বিল্ডিংয়ের টপ ফ্লোরে আমাদের কোম্পানি। সপ্তাহখানেক আগে অ্যানি মুম্বাই থেকে এখানে কন্সট্রাকচুয়াল বেসিসে একটা কাজ করতে আসে। আমাদের সঙ্গে একই অফিসে কাজ করার সুবাদে ওর সঙ্গে একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিল...’

‘সখ্যতা মানে কি ভালোবাসা?’ অনিকেতের কথার মাঝেই প্রশ্ন করে কিটি।

অনিকেত বলল, ‘না না, ওসব কিছু নয়। প্রাইমারি স্টেজের ফ্রেন্ডশিপ বলতে পারেন। ক-দিন অফিসের পর একসঙ্গে বাইরে গিয়েছি, এ পর্যন্ত।’ কিটি উত্তর শুনে বলল, ‘ওকে, ক্যারি অন।’ অনিকেত আবার বলতে শুরু করল, ‘ঘটনার দিন বিকাল বেলা অফিসের পর আমি আর অ্যানি দুজনে একসঙ্গে সিটি সেন্টারে গিয়েছিলাম। অ্যানির অফিসের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। পরদিন ওর মুম্বাইয়ের ফ্লাইট ধরার কথা। ও চলে যাওয়ার আগে আমাকে ট্রিট দেবে বলেছিল। আমার সঙ্গে নাকি ওর কীসব ইমপার্ট্যান্ট কথাও ছিল! এই দুটো কারণেই সেদিন একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সিটি সেন্টারের একটা দোকান থেকে আমাদের কোম্পানির ব্রেজার তৈরি করা হয়। দিন

তিনেক আগে বাস থেকে নামার সময় আমার অফিস ব্লেকারের বোতামটা ছিঁড়ে পড়ে যায়। ও-রকমই একটা বোতাম কেনার জন্য অ্যানিকে নিয়ে প্রথমে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ওই দোকানে যাই। ওরা বলেছিল বোতামটা এনে রাখবে। কিন্তু তখনও সেটা আসেনি। আমরা ওই দোকান ছেড়ে বাইরে আসার পরই অ্যানির মোবাইলে একটা ফোন আসে। কলটা রিসিভ করার পর ও বলে, বস, মানে সুরিসাহেব ওকে ডিউ পেমেন্ট নেওয়ার জন্য ডাকছেন। ওকে তখনই অফিসে যেতে হবে। কিছু করার নেই। বরং ঘণ্টাখানেক পর সঙ্গে সাড়ে সাতটা নাগাদ ও আমাকে ফোনে জানিয়ে দেবে যে, ও আমার সঙ্গে কোথায় মিট করবে। এই বলে ও একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যায় আর আমি সময় কাটানোর জন্য অটো ধরে চলে যাই করুণাময়ীতে, এক বন্ধুর বাড়ি, একটু থেমে অনিকেত বলে, ‘আমি একটু বেশি ডিটলে বলছি মনে হয়! আপনার সময় নষ্ট হচ্ছে না তো?’

কিটি বলল, ‘আপনি ডিটলেই বলুন। আমার বুঝতে সুবিধে হবে।’

অনিকেত আবার বলতে শুরু করে, ‘বন্ধুর বাড়িতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমি যখন বেরিয়ে আসি, তখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। খিদে পেয়ে গিয়েছিল বলে করুণাময়ীর মোড়ে একটা স্ন্যাক্সের দোকানে ঢুকে অল্প কিছু খাই। বড়ো জোর মিনিট দশেক ছিলাম সেখানে। এদিকে সাড়ে সাতটা বেজে গেলেও অ্যানি ফোন করছে না দেখে, দোকান থেকে বেরিয়ে ওকে ফোন করব ভেবে পকেটে হাত দিয়ে দেখি মোবাইলটা নেই! তখন মনে হয়, ওটা নিশ্চয়ই অফিসে, আমার কেবিনে ফেলে এসেছি! ওটা না থাকলে অ্যানি তো আমার সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারবে না! তারপর দিন আবার আমার অফ ডে ছিল।

সঙ্গেসঙ্গে একটা ট্যাক্সি নিয়ে অফিসে ছুটি। যখন ওখানে পৌঁছে ভাড়া মিটিয়ে বিল্ডিং ঢুকতে যাচ্ছি, তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে। বিল্ডিংয়ের ছাদে একটা সোডিয়াম ভেপার লাইট জ্বলে। ওটার আলোয় দেখতে পাই যে, ছাদের রেলিংয়ের ধারে অ্যানি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে! আমিও হাত নাড়ি। এরপর তাড়াতাড়ি বিল্ডিং ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করি। লিফ্টটা আবার ক-দিন ধরে আউট অব অর্ডার ছিল। প্রথমে উঠি আমাদের অফিস ফ্লোরে। অফিসে ঢুকলেই বাঁ-হাতে প্রথম ঘরটাই

আমার কেবিন। দরজা খোলাই ছিল। সেখানে ঢুকে প্রথমে মোবাইলটা পকেটে ঢোকাই। তারপর অফিসের বাইরে বেরিয়ে ছাদে উঠি সেখানে অ্যানিকে খুঁজতে। ছাদে ওকে দেখতে না পেয়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামছি, ঠিক সেই সময় অফিসের ভিতর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির সামনের প্যাসেজে দাঁড়িয়েছিল আমাদের অফিসের অনিল কাপাডিয়া। আমাকে ছাদের সিঁড়ি থেকে নামতে দেখে ও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে যে, আমি আবার অফিসে ফিরে এলাম কেন! আর ছাদেই বা কী করতে গিয়েছিলাম? আমি বলি যে, আমি মোবাইলটা নিতে আবার ফিরে এসেছি। অ্যানি আমাকে ছাদে ডাকছিল বলে আমি ছাদে ওকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, এই কথাটা বলতে আমার কেমন বাধো বাধো ঠেকছিল! প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্য অফিসের একটা কাজ নিয়ে ওর সঙ্গে কথাও বলতে শুরু করি। আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে মিনিট তিন-চার কথা বলার পর হঠাৎ নীচ থেকে একটা লোক এসে বলে, ‘ছাদ থেকে একজন নীচে পড়ে গিয়েছে!’ ব্যাপারটা বুঝে উঠতে আমাদের মিনিট দুই সময় লাগে। অফিসের ভিতর ঢুকে অন্যদেরও আমরাই খবর দিই। তারপর সকলে মিলে নীচে গিয়ে দেখি, বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে মাটিতে পড়ে আছে অ্যানি, পাশে পড়ে আছে ওর লেডিজ ব্যাগটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুরিসাহেবও। ওঁর মোবাইল থেকে তখনই অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশকে ফোন করা হয়। পুলিশই আগে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। অ্যানির হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় একটা বোতাম। ব্যাগে রাখা মোবাইলে পাওয়া যায় আমার মোবাইল থেকে পাঠানো মেসেজ। জিজ্ঞাসাবাদের সময় অনিলও বলে ও আমাকে সে ছাদ থেকে নামতে দেখেছে, আর তারপরই...’ কথা শেষ করে মাথা নিচু করল অনিকেত।

কিটি ওর কথা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ‘আপনার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় আপনাকে কেউ ফাঁসিয়েছে। প্রমাণগুলো কিন্তু আপনার বিপক্ষেই! আচ্ছা, অফিসে কারো সঙ্গে আপনার প্রফেশনাল জেলসি বা অন্য কোনো ঝামেলা আছে? মানে, আপনার এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ হয়?’

অনিকেত বলল, ‘সুরিসাহেবকে বাদ দিয়ে আমি ছাড়া আমাদের অফিসে আর তিনজন স্টাফ। অনিল কাপাডিয়া, সঞ্জীব বসু আর সানা রায়। প্রত্যেকের



সঙ্গেই আমার ভালো সম্পর্ক। সন্দেহ করার মতো তো তেমন কাউকে দেখছি না।’

‘আর মি. সুরির সঙ্গে?’ জিজ্ঞেস করল কিটি।

‘তিনি তাঁর স্টাফদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করেন। ওঁর সঙ্গে আমার কোনো ঝামেলা নেই।’

টিনা এতক্ষণ পর আবার পাশ থেকে বলল, ‘অ্যানির সঙ্গে অফিসের কারো কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল কি?’

অনিকেত বলল, ‘না তেমন কিছু হয়নি। তবে ও আসার দু-দিনের মাথায় সঞ্জীবের সঙ্গে অল্প কথা কাটাকাটি হয়েছিল। অ্যানি নাকি সঞ্জীবের কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড ব্রেক করেছিল। অবশ্য ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায়নি। ও দুঃখপ্রকাশ করায় ব্যাপারটা মিটে যায়।’

কিটি এবার জিজ্ঞেস করল, ‘অ্যানি, মিস না মিসেস ছিলেন? এখানে এসে কোথায় উঠেছিলেন উনি?’

সে জবাব দিল, ‘ও আনম্যারেড ছিল। সাতাশ বছর বয়স। কিড স্ট্রিটে একটা গেস্ট হাউজে উঠেছিল।’

‘আর আপনি?’ টিনা জিজ্ঞেস করল।

অনিকেত বলল, ‘আমারও বিয়ে হয়নি। বাবা-মা দিল্লিতে থাকেন। এখানে আমি একাই থাকি।’ কিটি টেবিলের উপর রাখা একটা পেপারওয়ায়েট নাড়াতেনাড়াতে বলল, ‘আচ্ছা ব্যাপারটা তো সুইসাইডও হতে পারে। আপনাদের পেশায় কাজের চাপের কারণে অনেক সময় অনেকে মানসিক অবসাদে ভোগে। ওর কি সে-রকম কোনো চাপ ছিল? সেদিন ওর ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন?’

কিটির কথা শুনে একটু চুপ করে থাকার পর অনিকেত বলল, ‘আমাদের পেশায় চাপ তো থাকেই। তবে ও খুব হাসিখুশি মেয়ে ছিল। কোনো অবসাদে ভুগছিল বলে তো মনে হয়নি। তবে দিন তিনেক ধরে কথা বলতে বলতে কেমন যেন চুপ মেরে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে। অবশ্য এই অবজারভেশনটা আমার মনের ভুলও হতে পারে। কিন্তু একটা কথা, আমাকে যে ওর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার আছে, এটা ও আগেও বলেছিল। এই ঘটনার দু-দিন আগে ওই কথা শোনার জন্য আমি ওর সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটে ব্লু-হেভেন বলে একটা ডিস্কেও

গিয়েছিলাম। ওখানে যাওয়ার প্রস্তাব অবশ্য ও-ই দিয়েছিল। আমি এমনিতে ডিস্ক বা নাহট ক্লাবে বিশেষ যাই না। সেদিন রাত ন-টা নাগাদ ওখানে গিয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সেদিনও আমাকে ও সেই কথাটা বলার সুযোগ পায়নি। আমরা ওখানে ঢোকান মিনিট কয়েকের মধ্যেই অনিল কাপাডিয়াও উপস্থিত হয়। ও অবশ্য আমাদের দেখেনি। কিন্তু ওকে দেখার পরই আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে আসি। অ্যানি ওখানে আর থাকতে দেয়নি আমাকে।’

‘কেন?’ জিজ্ঞেস করল কিটি।

‘কারণ, ও চায়নি আমাদের নিয়ে অফিসে কোনো গসিপ হোক। তা ছাড়া অনিল নাকি দিন দুয়েক আগেই অ্যানিকে প্রপোজ করেছিল! ওকে দেখে অস্বস্তি লাগছিল অ্যানির। অনিল বসের খুব কাছের লোক। বস না থাকলে অনিলই অফিস সামলায়।’

কিটি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে প্রশ্ন করল, ‘অ্যানি ঠিক কী কাজ করতে আপনাদের ওখানে এসেছিল?’

অনিকেত বলল, ‘একটা সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের কাজে। তবে ঠিক কী সফটওয়্যার, তা বলতে পারব না। বসের নিজের কম্পিউটারে কাজটা করছিল ও। তবে সিকিয়ারিটি সংক্রান্ত কোনো কাজ হতে পারে। কারণ, একদিন কথাপ্রসঙ্গে ও আমাকে বলেছিল যে, সফটওয়্যার সিকিয়ারিটির ব্যাপারে ওর কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। ও মুম্বইয়ে এথিকস বলে একটা ফার্মে এ নিয়ে কাজ করেছে।’

কিটি বলল, ‘আই সি। আপনার কাছে আমার একটা শেষ প্রশ্ন আছে। আপনি ঘটনার দিন ঠিক ক-টার সময় অফিসে ফিরে এসেছিলেন?’

একটু ভেবে অনিকেত মিত্র জবাব দিল, ‘আমি যখন বেসমেন্ট থেকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করি, তখন ল্যান্ডিংয়ের দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়িতে আটটা বেজে দশ মিনিট হয়েছে। ওই ঘড়িটার সঙ্গেই আমাদের অফিসের সকলের ঘড়ি মেলানো থাকে।’

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর সোজা হয়ে বসল কিটি। তারপর অনিকেত মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনার সব কথা শুনলাম। তবে আপনার কেসটা নেব কি না, তা আপনাকে বিকেলে জানাব। আপাতত আপনার কন্ট্যাক্ট নম্বর আমাকে দিয়ে যান। আপনার আগের মোবাইলটা তো নিশ্চয়ই সিজ করেছে পুলিশ?’

অনিকেত বলল, ‘হ্যাঁ, মোবাইল আর ব্লেজার, দুটোই।’

অনিকেত অন্য একটা মোবাইল নম্বর বলল কিটিকে। কিটি নম্বরটা নিজের মোবাইলে সেভ করে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অনিকেত মিত্রও উঠে দাঁড়াল। একটু ইতস্তত করে সে বলল, ‘আপনার ফিজটা?’

কিটি বলল, ‘যদি কেসটা নিই, তখন বলব।’

॥ ২ ॥

অনিকেত মিত্র চলে যাওয়ার পর সোফায় শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল কিটি।

টিনা বলল, ‘কী রে, কী মনে হচ্ছে?’

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে কিটি বলল, ‘এত তাড়াতাড়ি ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যি-মিথ্যে যাচাইয়ের জন্য ফিল্ড ওয়ার্ক করতে হবে। প্রথমে জানতে হবে, ছেলেটা যা বলে গেল তার মধ্যে কতটা সত্যি আছে? আচ্ছা, ছেলেটাকে দেখে তোর কী মনে হল?’

টিনা হেসে বলল, ‘ও সত্যি বলছে, না মিথ্যে, সেটা বলতে পারব না। তবে দেখতে দারুণ! তাকানোর মধ্যে একটা সেক্স অ্যাপিল আছে!’ কিটি মৃদু ধমক দিয়ে বলল, ‘ডোন্ট বি সিলি! সিরিয়াসলি ভাবার চেষ্টা কর। ওর কথা শুনে কী মনে হল?’

টিনা বলল, ‘ছেলেটা যদি পাকা ক্রিমিনাল বা অভিনেতা না হয়ে থাকে, তবে ওর চোখ-মুখ দেখে মনে হল তো, ও সত্যি কথাই বলছে।’

কিটি একবার তার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর সোফা ছেড়ে উঠে বলল, ‘চ, কাজ শুরু করে দিই। সেক্টর ফাইভে একবার টুঁ মেরে আসি। দেখি, ওখান থেকে কী ইনফো পাওয়া যায়।’

মিনিট দশেকের মধ্যেই ফ্ল্যাটের নীচের রাস্তায় এসে দাঁড়াল কিটিরা। তারপর একটু হেঁটে ফুলবাগানের মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হল সেক্টর ফাইভের উদ্দেশ্যে। ওখানে পৌঁছে একটু খোঁজাখুঁজির পর একসময় পেয়েও গেল দরকারি বিল্ডিংটা। ট্যাক্সি থেকে নেমে কিটি একবার ভালো করে দেখল কুইন্স ম্যানসনটা। সাদা রঙের বিল্ডিং। বেসমেন্টে বেশ কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা আছে। জনাকয়েক লোকও ঘুরঘুর করছে। বিল্ডিংটার পাশেই

একদম গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা সাদা রঙের দশতলা বিল্ডিং। দুটো বিল্ডিংয়ের মাঝে একটা একটা সফর রাস্তা আছে। ওরা এগিয়ে গিয়ে বেসমেন্টের কাছে একজন সিকিয়ারিটির লোককে জিজ্ঞেস করতে সে উপরে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিল। গ্রাউন্ড ফ্লোরের একপাশে স্টেয়ারকেস। আর তার পাশেই লিফট। অনিকেতের বলা ঘড়িটাও চোখে পড়ল কিটিদের।

কিটি বলল, ‘আমরা লিফটে যাব না। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠব। ফ্লোরগুলো দেখা যাবে তাহলে।’ উপরে উঠতে শুরু করল ওরা। প্রতিটা ফ্লোরে আলাদা-আলাদা কোম্পানির অফিস। প্রায় সবই কম্পিউটার ফার্ম। দু-একজন ঢুকছে, বের হচ্ছে। ওরা ধীরেসুস্থে উঠে এল সিক্সথ ফ্লোরে।

কিটি ঘড়ি দেখে বলল, ‘সাধারণভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে প্রায় চার মিনিট সময় লেগে গেল।’ সিঁড়ির বাঁ-পাশে বাঁক নিয়ে ছাদের দিকে উঠে গিয়েছে। ঠিক মুখোমুখি একটা কাচের দরজা। তার মাথার ওপর ভিনাইল বোর্ডে লেখা ‘গ্লোবাল প্রসপেক্ট’। আর ডান দিকে লিফটের গেট। কাচের দরজার বাইরে থেকে ভিতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিটি এগিয়ে গেল সেই দরজার দিকে। দরজা ঠেলে ভিতরে পা রেখেই ওরা বুঝতে পারল অফিসটা সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশন্ড এবং খুব ভালো করে সাজানো। টাইলস বসানো একটা প্যাসেজ কিটিদের সামনে থেকে সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে কাচের দরজাঅলা ঘরের মুখে। প্যাসেজের ডান দিকে বেশ কয়েকটা কাচের দরজা, বাঁ-দিকে দেওয়াল। মাথার উপর কারুকাজ করা নীচু প্রাইউডের সিলিঙে উজ্জ্বল আলো বসানো। ঝকঝকে টাইলসে সেই আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। চারিদিকে রুম ফ্রেশনারের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢুকে প্রথমে কোনো লোককে দেখতে পেল না ওরা। আর তারপরই সাদা জামা-প্যান্ট আর কালো ব্রেজার গায়ে একটা লোক ডান পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মনে হয়, লোকটা পাশের অন্য একটা ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। কিটিদের দেখতে পেয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ‘ইয়েস ম্যাম?’

কিটি জবাব দিল, ‘উই ওয়ান্ট টু মিট মি. সুরি।’ লোকটা একবার ঘাড় নাড়ল। তারপর প্যাসেজের শেষ প্রান্তের কাচের দরজাটা ইশারায় দেখিয়ে নিজে অন্য একটা ঘরে ঢুকে পড়ল। কিটিরা দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা সামান্য ফাঁক করা আছে। কিটি দরজার কাঠের প্যানেলে দু-বার মৃদু

টোকা দিতেই ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ইয়েস, কাম ইন।'

দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর পা রাখল তারা। সামনেই একটা টেবিলের ওপাশে নীল রঙের রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক। টেবিলের উপর রাখা আছে একটা সাধারণ কম্পিউটার, একটা ল্যাপটপ আর কিছু কাগজপত্র। বোধ হয় ল্যাপটপটা নিয়ে কাজ করছিলেন ভদ্রলোক। ওরা ঘরে ঢোকার পর তিনি ওদের দিকে তাকাতেই কিটি এগিয়ে গিয়ে নিজের ভিজিটিং কার্ডটা ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিল। উনি কার্ডটা হাতে নিয়ে সেটা দেখতে যতটুকু সময় নিলেন, তার মধ্যেই কিটি ভালো করে দেখে নিল তাঁকে। ভদ্রলোকের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। মাথার চুল সাদা রঙের ব্লিচ করা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, রং পরিষ্কার। ধূসর সুট পরা ভদ্রলোকের চেহারা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। কার্ডে চোখ বোলানোর পর তিনি ওদের টেবিলের এপাশে রাখা চেয়ারে বসতে ইশারা করলেন। ওরা বসার পর তিনি কয়েক মুহূর্ত ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে শাস্ত গলায় বললেন, 'আপনারা কি এখানে যে মিসহাপ হয়েছে সে-ব্যাপারে কিছু জানতে এসেছেন?'

কিটি বলল, 'হ্যাঁ, আমরা মিস অ্যানির অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে এসেছি।'

ভদ্রলোক আবার শাস্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনারা তো পুলিশের লোক নন। কে অ্যাপয়েন্ট করল আপনাদের?'

কিটি মৃদু হেসে জবাব দিল, 'এটা আমাদের প্রফেশনাল সিক্রেট।'

তিনি বললেন, 'ওঃ, আই অ্যাম সরি। প্রশ্নটা করা আমার উচিত হয়নি। আমি আপনাদের কী সাহায্য করতে পারি বলুন।'

কিটি বলল, 'আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। আশা করি, আপনি কো-অপারেট করবেন।' ভদ্রলোক সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

কিটি প্রথম প্রশ্ন করল, 'আপনার কী মনে হয়, এটা আত্মহত্যা না খুন?'

মি. সুরি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। পুলিশ অনিকেত বলে আমার এক স্টাফকে সন্দেহবশত অ্যারেস্ট করেছে, এ খবর শুনেছেন নিশ্চয়ই। অবশ্য সে কেন এ কাজ করতে যাবে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!'

কিটি প্রশ্ন করল, 'আপনার অফিসে কারো সঙ্গে মিস অ্যানির কোনো ঝগড়া হয়েছিল কি?' মি. সুরি জবাব দিলেন, 'না, তেমন কিছু ঘটছে বলে জানা

নেই। সরকারি অফিসে অনেক সময় এসব হয়। আমাদের মতো প্রাইভেট ফার্মে কাজের চাপ এত বেশি থাকে যে, ঝগড়া করারও সময় থাকে না! অ্যানি আমার কম্পিউটার নিয়ে পাশের ঘরে বসে একাই কাজ করত। একটা ইনস্টলেশনের কাজ করছিল ও।’

কিটি জিঞ্জের করল, ‘আচ্ছা, ও কি কোনো মানসিক অবসাদে ভুগছিল, যার জন্য আত্মহত্যা করতে পারে? বা ওর আচার-আচরণে আপনি ইদানীং কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন?’ ‘উঁহু, আমি এমন কিছু লক্ষ্য করিনি,’ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন ভদ্রলোক।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কিটি জানতে চাইল, ‘অ্যাস্সিডেন্টের খবরটা কীভাবে আপনি জানতে পারলেন?’

মি. সুরি বললেন, ‘ইন ফ্যাক্ট, আমিই খবরটা প্রথম পাই। আটটার সময় আমি সিঁড়ি দিয়ে বেসমেন্টে নেমেছিলাম গাড়িতে রাখা একটা ফাইল আনতে আর স্মোক করার জন্য। আটটা পনেরো নাগাদ বেসমেন্টে আমাকে বিল্ডিংয়ের পিছন দিক থেকে একটা লোক এসে জানায় যে, ছাদ থেকে একজন নীচে পড়ে গিয়েছে! সঙ্গেসঙ্গে আমি দৌড়ে যাই বিল্ডিংয়ের পিছনদিকে। আমি দেখতে পাই অ্যানি পড়ে আছে সেখানে। একদম নিখর ওর দেহ। তখন যে আমাকে খবরটা দিয়েছিল, ওকে উপরে, মানে এখানে পাঠাই অন্যদের ডাকার জন্য।’

তঁার কথা শোনার পর কিটি বলল, ‘আচ্ছা, অনিকেত কখন অফিসে ফিরে এসেছিল আপনি জানেন?’

‘আমি নীচে নামার একটু পরই। আমাদের লিফট খারাপ ছিল সেদিন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার আগে আমার সঙ্গে ওর চোখাচোখিও হয়। ও উপরে উঠে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আমি অ্যাস্সিডেন্টের খবরটা পাই।’

‘অ্যানিকে তো আপনিই ফোন করে সেদিন অফিসে ডেকে এনেছিলেন, তাই না? ও কখন অফিসে ফিরে এসেছিল?’

‘হ্যাঁ, আমিই ওর মোবাইলে ফোন করেছিলাম। হাজার দশেক টাকা পেমেন্ট বাকি ছিল, সেটা দেওয়ার জন্য। টাকাটা পেমেন্ট করে দিই আমি। পুলিশ ওর ব্যাগে টাকাটা পেয়েছে।’ একটু থেমে তিনি বললেন, ‘সম্ভবত সাতটা নাগাদ ও ফিরে আসে। আমি তার মিনিট পনেরো পরে ফিরি।’

কিটি চুপ করে কয়েক মুহূর্ত কী ভাবল! তারপর মি. সুরির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করবেন না। উত্তর দেওয়াটা অবশ্য আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল। সেদিন অফিসে আসার পর থেকে আপনি ঠিক কী কী করেছিলেন একটু বলবেন?’

মি. সুরি একটু হাসলেন। তারপর বললেন, ‘ঠিক দশটার সময় প্রতিদিনের মতো সেদিনও অফিসে আসি। লিফ্ট খারাপ বলে সেদিন আর দুটোর সময় লাঞ্চ করতে নামিনি। দশটা থেকে টানা সাড়ে চারটে পর্যন্ত এ ঘরে বসে কাজ করি। তার পর অফিস থেকে বেরিয়ে নিয়ে নেমে গাড়ি নিয়ে চলে যাই থিয়েটার রোডে কাপাডিয়া ডেটা সার্ভিস নামে এক কোম্পানিতে, মি. রাজেশ কাপাডিয়ার কাছে। আমাদের কোম্পানির সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক যোগাযোগ আছে। সেখানে কাজ সেরে যখন অফিসে ফিরি, তখন সোয়া সাতটা বাজে। তারপর এ ঘরেই ছিলাম। উঠি আটটায়।’

কিটি বলল, ‘এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করি? এখানে তো সফটওয়্যারের কাজ জানা অনেক লোক পাওয়া যায়। হঠাৎ মুম্বই থেকে অ্যানিকে নিয়ে এলেন কেন? কোনো বিশেষ কারণে?’

ভদ্রলোক বললেন, ‘না, তেমন কোনো বিশেষ কারণ নেই। আসলে ইন্টারনেটে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম আমরা। ও সেটা দেখে অ্যাপ্লাই করে। কাজের টার্মস-কন্ডিশন দু-দলেরই মনো মতো হওয়ায় ও আসে।’

কিটি বলল, ‘তাহলে ওর বায়োডেটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে। ওর একটা কপি দেবেন আমাকে?’

মিঃ সুরি বললেন, ‘ওঃ শিয়োর!’ টেবিলের উপরে রাখা কম্পিউটার থেকে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই অ্যানির বায়োডেটার একটা প্রিন্ট আউট বের করে কিটির হাতে দিয়ে দিলেন মি. সুরি।

কিটি সেটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বোলাল। তারপর বলল, ‘থ্যাক্স ইউ, মি. সুরি। আপনার কাছে আমার যা জানার ছিল, তা জানা হয়ে গিয়েছে। তবে আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। সেদিন ওই ঘটনার সময় আপনার অন্য অফিস স্টাফ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাদের সঙ্গে আমি একটু আলাদাভাবে কথা বলতে চাই।’ ওর অনুরোধ শুনে মি. সুরি কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, ‘আপনারা মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা

করুন। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তবে সেদিন যারা ছিল, তাদের মধ্যে একজন আজ অফিসে আসেনি। অনিল কাপাডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে হলে আপনাদের কাল আসতে হবে।’

কিটি জবাবে বলল, ‘ঠিক আছে। যাঁরা আছেন, তাদের সঙ্গেই কথা বলব। আপনি ব্যবস্থা করুন, আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছাদ থেকে ঘুরে আসছি।’ এই বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিটি।

মি. সুরি বললেন, ‘আসুন।’

কিটির মি. সুরির অফিস থেকে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে গিয়ে পৌঁছেল। বেশ উঁচু সিমেন্টের রেলিং দিয়ে ছাদের চারপাশ ঘেরা। রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে কিটি বলল, ‘রেলিংয়ের যা হাইট দেখছি, তাতে এটা টপকে সাধারণভাবে নীচে পড়ে যাওয়ার কোনো চান্সই নেই। হয় অ্যানি আত্মহত্যা করেছে, নয়তো কেউ ওকে নীচে ফেলে দিয়েছে। আর অনিকেতের বক্তব্য যদি সত্যি হয় যে, অ্যানি ছাদ থেকে ওর উদ্দেশ্যে সত্যিই হাত নেড়েছিল, তাহলে বুঝতে হবে এটা খুনই। কারণ, যে মিনিট খানেকের মধ্যে সুইসাইড করতে চলেছে, সে নিশ্চয়ই ওভাবে কারো উদ্দেশ্যে হাত নাড়বে না!’

পুরো সেক্টর ফাইভ দেখা যাচ্ছে উপর থেকে। পাশের বিল্ডিংয়ের ঘরের ভিতরটাও একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! লোকজন বসে কাজ করছে। টিনা হঠাৎ পাশের বিল্ডিংয়ের ছাদের সোজাসুজি একটা খোলা জানলার দিকে আঙুল তুলে বলল, ‘ওই দেখ নীলাঞ্জন, আমাদের ফ্ল্যাটের থার্ড ফ্লোরে থাকে।’

কিটি ওর কথা শুনে তাকিয়ে দেখল মেয়েটিকে। ফ্ল্যাটে ওকে দু-একবার দেখলেও নাম জানত না কিটি। ও টিনাকে বলল, ‘তুই তো সকলের নাম একেবারে মুখস্থ করে রেখেছিস! ওকেও প্রপোজ করেছিলি নাকি?’

কিটির কথায় টিনা বলল, ‘না, ওর সঙ্গে আমাদের সেকেন্ড ফ্লোরের সানিয়ার অ্যাফেয়ার আছে। দুজনকে আমি একসঙ্গে আইনস্ট্রো দেখেছি।’ কিটি আর কিছু না বলে ঘুরে ঘুরে ছাদটা দেখতে শুরু করল। বিল্ডিংয়ের পিছনের অংশটাও একবার উঁকি মেরে দেখল। কিন্তু সন্দেহজনক তেমন কিছু ছাদে ওর চোখে পড়ল না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওরা ছাদ থেকে নেমে আবার অফিসে ঢুকল। মি. সুরি তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কিটিদের ইন্টারভিউয়ের জন্য একটা ঘর দেখিয়ে, সেখানে ওদের বসতে বললেন।



ওরা সে-ঘরে ঢুকে বসার পর প্রথম যে ঘরে ঢুকল, তাকে আগেই একবার দেখেছে কিটিরা। অফিসে ঢোকার পর এই লোকটিই মি. সুরির ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল। লোকটা ঘরে ঢোকার পর তাকে ওদের সামনের চেয়ারে বসতে বলল কিটি। টিনা কাচের দরজা বন্ধ করে কিটির পাশের চেয়ারে বসল। কিটি একবার ভালো করে দেখল তার সামনে বসে থাকা লোকটাকে। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। চোখে ভারী চশমা, মনে হয় মাইনাস পাওয়ার। লোকটার চেহারা বেশ শক্তপোক্ত ধরনের। এ ছাড়া খুব বিশেষত্ব নেই। লোকটার কালো ব্রেজারের বুকে মনোগ্রাম করে ‘জি’ আর ‘পি’, এই দুটো অক্ষর লেখা আছে। কিটি সেদিকে তাকিয়ে প্রথমে বলল, ‘এই ব্রেজারটা তো মনে হয় আপনাদের ড্রেস কোড, তাই না?’

উনি জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ, কোম্পানি থেকে দেওয়া হয়েছে।’

কিটি জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার নাম? কোথায় থাকেন?’

‘আমি সঞ্জীব বসু। কসবা, সুইনহো লেনে আমার বাড়ি। ওখানকার পুরোনো বাসিন্দা আমরা,’ উত্তর দিলেন ভদ্রলোক।

কিটি সরাসরি সাবজেক্টে ঢুকে পড়ে বলল, ‘আমরা কেন এসেছি, তা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছেন। আপনার কি মনে হয় অনিকেত সত্যিই অ্যানিকে ফেলে দিয়েছে? সহকর্মী হিসেবে ওকে কেমন ছেলে বলে আপনার মনে হয়?’

সঞ্জীব বসু বললেন, ‘ও ফেলে দিয়েছে কি না জানি না। তবে অনিকেতকে ভালো ছেলে বলেই জানি। ওর ব্যবহারও খুব ভালো, হেল্পফুল।’

কিটি বলল, ‘ও। আচ্ছা, সেদিন আপনি অফিসে আসার পর থেকে, বিশেষত সন্দের পর থেকে ওই ঘটনা কানে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কী করছিলেন একটু ভেবে বলবেন? কীভাবে খবরটা পেলেন আপনি?’

দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর আগে দিলেন ভদ্রলোক। বললেন, ‘আমি ঘরে বসে কাজ করছিলাম। অনিল কাপাডিয়া এসে আমাকে খবরটা দেয়। সেদিন দুটোর সময় অফিসে ঢুকেছিলাম। সকালে একটা ব্যক্তিগত দরকারে দমদম যেতে হয়েছিল। অফিসে আসার পর নিজের ঘরে ঢুকে কাজ করছিলাম। সন্ধ্যা ছ-টা নাগাদ একবার অফিস ছেড়ে বেরিয়ে নীচে নেমেছিলাম চা-টিফিন খাওয়ার জন্য। আধঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরে এসে কাজে বসে যাই। আটটা

নাগাদ মিনিট তিনেকের জন্য একবার ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম। পরে আবার ফিরে কাজে বসি।’ কিটি সঙ্গেসঙ্গে প্রশ্ন করল, ‘আটটার সময় আপনি ঘর ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন? অন্য কারো ঘরে?’

সঞ্জীব বসু বললেন, ‘না। কোমরটা একটু ধরে গিয়েছিল। তাই অফিসের কাচের দরজার সামনে সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।’

কিটি ওঁর কথা শুনে বলল, ‘সেসময় আপনি কাউকে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে দেখেছিলেন? মিস অ্যানি বা অন্য কাউকে?’

সঞ্জীব বললেন, ‘না, কাউকে ছাদে উঠতে দেখিনি। তবে আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ানোর পর পরই বস অফিসের বাইরে আসেন। আমার সামনেই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যান। নীচে নামতে নামতেই সম্ভবত উনি আমার মোবাইলে ফোন করে একটা ফাইল তখনই রেডি রাখতে বলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই অফিসে ঢুকে কাজে বসে যাই।’

সে এরপর বলল, ‘মিস অ্যানি কেমন মহিলা ছিলেন বলে মনে হয়?’

‘তেমন কিছু বলতে পারব না। ওর সঙ্গে দু-একদিন কথা বলেছি মাত্র। তাও বিশেষ প্রয়োজনে।’ এরপর একটু থেমে তিনি বললেন, ‘মহিলাদের সঙ্গে বিশেষ কথা বলার অভ্যাস আমার নেই।’

তাঁর কথা শুনে টিনা হেসে ফেলে বলল, ‘কেন! আপনি বিয়ে করেননি?’

‘না!’ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন তিনি।

কিটি তার শেষ প্রশ্নটা করল, ‘আপনার সঙ্গে তো শুনেছি মিস অ্যানির একটু ঝগড়ামতো হয়েছিল। ঠিক কী হয়েছিল ব্যাপারটা?’

কিটির প্রশ্ন শুনে কয়েক মুহূর্ত যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন সঞ্জীব বসু। একইসঙ্গে যেন একটু ভয়ও পেয়ে বললেন, ‘বিশ্বাস করুন, ওটা একটা সামান্য ব্যাপার ছিল। ও বসের ঘরের লাগোয়া ঘরটাতে বসে বসের কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছিল। আমাদের সকলের ঘরের ইন্টরিয়র একই রকমের। এমনকী, মাউস ম্যাটগুলো পর্যন্ত এক! তা ছাড়া বসের আর আমার কম্পিউটারের ক্যাবিনেট, কি-বোর্ড একই মডেলের। ও যে ঘরে কাজ করছিল, তার পাশেরটাই আমার ঘর। নতুন আসার ফলে ও ঘর ভুল করে আমার ঘরে চলে যায়। ব্যাপারটা যখন আমি ধরতে পারি, তখন একটু রেগে গিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে আমি সামান্য তর্কও করি। কিন্তু ও ভুল বুঝতে পেরে

দুঃখপ্রকাশ করায় ব্যাপারটা সেখানেই মিটে যায়। আমি কিন্তু কোনো রাগ পুষে রাখিনি। প্লিজ দেখবেন, আমি যেন মিস অ্যানির ব্যাপারে জড়িয়ে না যাই। এমনিতেই আমার...' কথাটা আর শেষ করলেন না তিনি। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে লাগলেন।

কিটি তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আসুন। দরকার হলে পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন সঞ্জীব বসু। উনি বেরিয়ে যাওয়ার পর কিটি চাপা গলায় টিনাকে বলল, 'নেস্টট কেসটা তুই হ্যান্ডল কর। বেসিক্যালি জানতে চাইবি, ওদিন বিকেলের পর ও কী কী করেছে, আর অ্যানির ব্যাপারে ও কিছু জানে কি না! তার বাইরে আমার কিছু জানার থাকলে আমি প্রশ্ন করব'খন।'

কিটির কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ঘরে ঢুকল একটি মেয়ে। তার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। বেশ লম্বা, স্লিম, চোখ-মুখও সুন্দর। তবে গায়ের রং একটু চাপা। একটা হালকা নীল শিফন শাড়ির উপর কালো রঙের একই রকম অফিস ব্লেজার পরে আছে। হালকা মেকআপও আছে মুখে। সম্ভবত ইনি আনম্যারেড। মেয়েটি ঘরে ঢুকে কিটির ইশারায় দরজা বন্ধ করে ওদের সামনের চেয়ারে এসে বসল।

টিনা ওর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনার নাম?'

'সানা রয়,' জবাব দিল মেয়েটি।

'কোথায় থাকেন আপনি?'

'আর এন টেগোর রোড, ওল্ড কালীবাড়ি, সোদপুর।'

'আপনাদের অফিস আওয়ার ক-টা পর্যন্ত?'

'দশটা থেকে ছ-টা পর্যন্ত। মাঝে টিফিন আছে। তবে কাজের চাপ থাকলে অনেক সময় আটটা-ন-টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়।'

'এখন কি খুব কাজের চাপ আছে?' জিজ্ঞেস করল টিনা।

'হ্যাঁ, সার্ভে ডিপার্টমেন্টের ডেটা প্রসেসিংয়ের একটা কাজ চলছে সাত-আট দিন ধরে,' উত্তর দিল সে।

টিনা মূল প্রসঙ্গে চলে গিয়ে বলল, 'আপনি তো এই কোম্পানির একমাত্র মহিলা কর্মী। মিস অ্যানির সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কেমন মেয়ে ছিলেন উনি?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর সানা ছোট্ট করে বলল, ‘ভালো।’  
টিনা প্রশ্ন করল, ‘ওদিন দুর্ঘটনার খবরটা ঠিক কখন, কার মুখ থেকে শোনেন আপনি?’

সানা বলল, ‘সাড়ে আটটার একটু আগে। আমি কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার জন্য রেডি হচ্ছিলাম। তখন মি. কাপাডিয়া আর ও আমার ঘরে এসে খবরটা দেয়।’

‘এই “ও”-টি কে?’

আবার একটু চুপ করে থেকে সানা জবাব দিল, ‘অনিকেত।’

টিনা জানতে চাইল, ‘ওই ঘটনার কথা শোনার কতক্ষণ আগে আপনি শেষবার ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন এবং কেন বেরিয়েছিলেন?’ সানা বলল, ‘পৌনে আটটা নাগাদ একবার ঘর থেকে বেরিয়ে অনিকেতের ঘরে ঢুকেছিলাম। তারপর বসের, অনিকেতের ঘর হয়ে প্রায় সপ্তসঙ্গেই নিজের ঘরে ফিরে আসি। অনিকেতের পাশেরটাই আমার ঘর। অনেকক্ষণ থেকে ওর ঘর থেকে মোবাইলে রিং হওয়ার শব্দ পাচ্ছিলাম। রিংটোনটা আমার চেনা। ওর ঘরে গিয়ে দেখি, মোবাইলটা ফেলে রেখে গিয়েছে...’

ওর কথার মাঝেই টিনা বলল, ‘তার মানে ও যে অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, তা আপনি জানতেন?’

ওর কথায় সন্তোষিত জানিয়ে সানা আবার বলল, ‘ততক্ষণে অবশ্য রিংটা থেমে গিয়েছে। প্রথমে ভাবলাম, মোবাইলটা নিজের কাছে রেখে দিই। তারপর ভাবলাম, ও যদি সাড়ে আটটার পর মোবাইল নিতে ফিরে আসে, তখন তো আমি থাকব না। বস রাত দশটা পর্যন্ত অফিসে কাজ করেন। তাঁর কাছেই মোবাইলটা দিয়ে আসি। এই ভেবে মোবাইলটা নিয়ে বসের ঘরে যাই। বস শুনে মোবাইলটা অনিকেতের টেবিলেই রেখে আসতে বলেন। উনি বলেন, তেমন হলে অফিস বন্ধ হওয়ার আগে মোবাইলটা ওখান থেকে নিয়ে নেবেন।’

কিটি এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথাবার্তা শুনছিল। ভালোই চালাচ্ছে টিনা। হঠাৎ ও প্রশ্ন করল, ‘আপনি কি তখন অ্যানিকে ওই ঘরে দেখেছিলেন?’

‘না, অ্যানি বসের ঘরে ছিল না। ও পাশের ঘরে বসেছিল, আমি দেখেছি,’ সানা উত্তর দিল।

কিটি আবার প্রশ্ন করল, ‘আচ্ছা, ওর সঙ্গে ওদিন কি কোনো কথা হয়েছিল আপনার? আপনি ওর আচরণে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করেছিলেন?’

সানা একটু ভেবে বলল, ‘না, তেমন কিছু লক্ষ করিনি। ঘটনার দিন সাড়ে সাতটা নাগাদ ও আমার ঘরে আসে। ওর একটা বই আমার কাছে ছিল। ও আমাকে বলে যে, বইটা ওকে আর ফেরত দিতে হবে না। ও আমাকে ওটা গিফ্ট করেছে। এও বলে যে, পরদিন ও মুম্বই ফিরে যাচ্ছে। মিনিট তিনেক কথা বলার পর ও বেরিয়ে যায়।’

টিনা বলল, ‘কী বই? কোনো ফ্যাশন ম্যাগাজিন, নাকি ফিল্ম পত্রিকা?’

ওর কথা শুনে হেসে ফেলল সানা। তারপর বলল, ‘না, না, ওসব নয়। কম্পিউটারসংক্রান্ত একটা বই,’ ‘দ্য বাইবেল অব হ্যাকিং’।’

টিনা বলল, ‘বিখ্যাত বই। নাম শুনেছি, পড়া হয়নি। প্রয়োজন হলে আপনার থেকে নেব।’ সানা হেসে বলল, ‘নিশ্চয়ই।’

কিটি এবার একটা কুট প্রশ্ন করল, ‘আপনি তো মহিলা, তাই আপনি কি বলতে পারেন, এই অফিসে এমন কি কেউ আছেন, যার অপোজিট সেক্সের প্রতি বাড়তি আকর্ষণ আছে?’

ওর প্রশ্ন শুনে আবার গম্ভীর হয়ে গেল সানা। বলল, ‘দুঃখিত, এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না।’ যেন ইচ্ছে করেই পাশ কাটিয়ে গেল! কিটি ওর শেষ প্রশ্ন করল, ‘আপনাকে অফিসের কেউ কোনোদিন প্রপোজ করেছে?’

সানা গম্ভীরভাবে বলল, ‘না।’

‘আর আপনি কাউকে?’ টিনা বলল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর মাথা নীচু করে সানা বলল, ‘হ্যাঁ, অনেকেতকে।’

সানার ইন্টারভিউ শেষ হল। এর পর মি. সুরির সঙ্গে কয়েকটা ধন্যবাদজ্ঞাপক কথা বলে অফিসের বাইরে এল ওরা। কয়েক মুহূর্ত লিফ্টের জন্য অপেক্ষা করতে হল। লিফ্টে নামতে নামতে লিফ্টম্যানকে কিটি ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞেস করল, ‘আপনাদের ডিউটি ক-টা থেকে ক-টা?’

সে বলল, ‘আমি একাই লিফ্টম্যান। আমার ডিউটি সকাল ন-টা থেকে সন্ধ্যা ছ-টা। অফিসের লোকরা নিজেরাই তারপর লিফ্ট চালায়।’

কিটিরা নীচে নেমে এল।

লাঞ্চ সেরে সোফায় আধশোয়া হয়ে বসে ছিল কিটি। মনে মনে ও অ্যানির কেসসংক্রান্ত কথাগুলো ভাবছিল। টিনা একটু দূরে বসে নেলপালিশে রিমুভার লাগাতে লাগাতে বলল, ‘কী ঠিক করলি, কেসটা তুই নিবি?’

কিটি একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, নেব ভাবছি। যদিও আত্মহত্যার তত্ত্বটা আমি একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না। তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা খুনই। অনিকেত খুনটা করুক বা না করুক, এই কেসটায় কিন্তু যথেষ্ট মাথা খাটাবার সুযোগ আছে। আর এজন্যই কেসটা নেব ভাবছি।’

টিনা বলল, ‘শুধু মাথা খাটানো নয়, দু-পয়সা যাতে আসে, তার ধান্দাও করিস। উত্তর কলকাতায় রিসেন্টলি একটা পার্লার খুলেছে। নাম করা অভিনেত্রীরা সব যায় ওখানে। যাব যাব করছি, কিন্তু পকেট পারমিট করছে না।’ কিটি ওর কথার কোনো জবাব দিল না।

টিনা এরপর জিঞ্জেস করল, ‘অফিসে যাদের মিট করলাম, তাদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ করছিস?’ কিটি বলল, ‘আরও ভালো করে খোঁজ নিতে হবে ওদের ব্যাপারে। স্টাফদের মধ্যে দুজনকে তো মিট করলাম, আরও একজন এখনও বাকি আছে। তবে এ দুজনেরও কিন্তু ব্যাপারটা ঘটানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে। এখন দেখতে হবে, এমন কোনো কারণ আছে কি না, যার জন্য খুনের মতো কাজ এরা করতে পারে?’

‘আর মি. সুরি? তাকে কীরকম বুঝলি?’ প্রশ্ন করল টিনা।

সে জবাব দিল, ‘বুদ্ধিমান মানুষ। ধীর-স্থির। প্রাথমিকভাবে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হল। আমরা পুলিশের লোক নই, তবু কো-অপারেট করলেন। কেউই সন্দেহের বাইরে নয়। তবে ওঁর একটা অ্যালিবাই আছে। ঘটনার সময় উনি নীচে ছিলেন। সঞ্জীব বসু আটটার সময় ওঁকে নীচে নামতে দেখেছেন। সুরির কথা যদি সত্যি হয়, তবে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় অনিকেতও দেখেছে ওঁকে।’ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর কিটি বলল, ‘এই ব্যাপারটা ভেরিফাই করে নিতে হবে অনিকেতের কাছ থেকে। তা ছাড়া, দেখি সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে ধরা যায় কিনা! শোয়ার ঘর থেকে আমার মোবাইলটা দে।’

টিনা মোবাইলটা এনে দিল। অনিকেতের নম্বরটা সেভ করাই ছিল।

বারকয়েক রিং হওয়ার পর ওপাশ থেকে তার গলা শোনা গেল, ‘হ্যালো...’

কিটি বলল, ‘আমি ক্যাটরিনা বলছি।’

অনিকেত বলল, ‘হ্যাঁ বলুন। আমি খুব উৎকর্ষার মধ্যে আছি। কেসটা আপনি নেবেন তো ম্যাম?’

কিটি একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘হ্যাঁ, ধরে নিন নিচ্ছি।’

‘থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম, থ্যাঙ্ক ইউ। কাইডলি আমাকে টেনশন থেকে মুক্তি দিন। বিশ্বাস করুন, আমি খুন করিনি। প্লিজ, আমাকে বাঁচান!’ একটা অসহায়বোধ বারে পড়ল ওর গলা থেকে। কিটি বলল, ‘দেখছি। আচ্ছা, সেদিন যখন আপনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিলেন, তখন কি মি. সুরিকে দেখেছিলেন?’

অনিকেত বলল, ‘হ্যাঁ। কথাটা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। লিফ্ট কেসের সামনে দাঁড়িয়ে উনি সিগারেট খাচ্ছিলেন।’

‘কোনো ফাইল বা কাগজ ওঁর হাতে ছিল?’

অনিকেত একটু চিন্তা করে জবাব দিল, ‘ঠিক মনে করতে পারছি না।’

কিটি বলল, ‘ঠিক আছে। আপনার কলিগদের ফোন নম্বরগুলো একটু আমাকে দিতে পারেন?’

সে বলল, ‘এক মিনিট হোল্ড করুন। আমি টেলিফোন ইনডেক্স দেখে বলছি।’

এক মিনিটের মধ্যেই নাম-নম্বরগুলো পরপর বলে গেল অনিকেত। কিটি নম্বরগুলো একটা রাইটিং প্যাডে টুকে নেওয়ার পর প্রশ্ন করল, ‘আপনার কেসটা পুলিশের কে দেখছে বলুন তো?’

‘সংশ্লিষ্ট থানার একজন অফিসার, মি. সামন্ত। তবে পুরো নামটা জানি না।’

কিটি বলল, ‘ঠিক আছে এতেই হবে। আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি। আশা করি, তদন্তের স্বার্থে সঠিক উত্তর দেবেন। সানা রয় কি প্রপোজ করেছিল আপনাকে?’

একটু চুপ করে থেকে অনিকেত বলল, ‘হ্যাঁ।’ ‘আপনি অ্যাকসেস্ট করেছিলেন কি না জানতে পারি কি?’

আবার একটু চুপ করে থেকে অনিকেত বলল, ‘না। ওর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যার ফলে সম্ভব হয়নি। আমার বাবা-মা মেনে নিতেন না।’

‘কী ব্যাকগ্রাউন্ড?’

‘সানা উইডো। ওর স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ও বলেছিল, সুইসাইড। কেউ কেউ বলে ও-ই নাকি বিষ দিয়ে খুন করে ওর স্বামীকে।’

কিটি শোনার পর বলল, ‘আচ্ছা, রাখছি। পরে আবার যোগাযোগ করব।’

লাইনটা কেটে দিল কিটি। তারপর অনিকেতের দেওয়া নম্বরগুলোর থেকে একটা মোবাইল নম্বর বেছে নিয়ে দ্বিতীয় ফোনটা করল। ওপাশে কলারটিউন শোনা গেল, ‘তেরি আঁখে ভুলভুলাইয়া, বাতে হায়াঁ ভুলভুলাইয়া...’ একটা চালু হিন্দি ছবির গান। লাউডস্পিকারে রেখে টিনাকে গানটা শোনাল কিটি।

টিনা বলল, ‘বেশ সরেস মাল মনে হচ্ছে!’

বেশ কিছুক্ষণ গানটা বাজার পর অবশেষে শোনা গেল, ‘হ্যালো, অনিল স্পিকিং...’

কিটি তাড়াতাড়ি লাউডস্পিকার বন্ধ করে জবাব দিল, ‘ক্যাটরিনা সেন, ফ্রম ক্যাটরিনা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।’

ওদিক থেকে কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ শোনা গেল না। তারপর শোনা গেল, ‘আপনি তো আমাদের অফিসে আজ তদন্ত করতে গিয়েছিলেন, তাই না?’

খবরটা ইতিমধ্যেই যে অনিল কাপাডিয়াসের কানে চলে গিয়েছে, তা বুঝতে পারল কিটি। ও বলল, ‘হ্যাঁ। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।’

‘বলুন।’

কিটি বলল, ‘টেলিফোনে তো সব কথা বলা যায় না। আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই এবং কাইন্ডলি সেটা আজ হলে ভালো হয়।’

‘বিকলে একটু ব্যস্ত আছি। সন্দের দিকে বা তার একটু পরে হলে আপত্তি আছে? তখন ফ্রি থাকব।’

‘কখন?’

‘ন-টা নাগাদ?’

কিটি জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায়?’

সে বলল, ‘পার্ক স্ট্রিটে, ব্লু হেভন বলে একটা ডিস্ক আছে। আশা করি, ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো রিজার্ভেশন নেই?’

কিটি বলল, ‘না, নেই। তাহলে ঠিক রাত ‘ন-টা তো? আপনি আমাকে চিনবেন কী করে?’



অনিল কাপাডিয়া বোধ হয় একটু হাসল। তারপর শুধু বলল, ‘মহিলাদের চেনার আমার সহজাত একটা ক্ষমতা আছে।’

লাইনটা কেটে গেল। মোবাইলটা টেবিলে রেখে কিটি প্রথমে টিনাকে বলল কথাগুলো। তারপর বলল, ‘সানা রয় যার সম্পর্কে উত্তরটা “জবাব দিতে পারব না” বলে এড়িয়ে গিয়েছিল, সে মনে হয় অনিল কাপাডিয়াই। আজ রাতে আমার হার্টসের টেক্সা কিন্তু তুই! কোম্পানির ভিতরে কোনো ব্যাপার থাকলে, মি. সুরির ঘনিষ্ঠ বলে ওর সেটা জানার সম্ভাবনা আছে। যতটা সম্ভব কথা ওর থেকে বের করতে হবে।’

টিনা ঝাঁঝিয়ে বলল, ‘কথা বের করার জন্য আমাকে ওর সঙ্গে ফ্লাট করতে হবে নাকি! তুই কি আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করবি?’

কিটি গম্ভীরভাবে বলল, ‘না, ঠিক টোপ নয়। আসলে আমি প্রফেশনালি কাজটা করতে চাইছি।’

বিদেশে সিক্রেট এজেন্সিতে যারা কাজ করে, তারা কিন্তু এ জাতীয় কাজ উদ্ধারের জন্য সেক্সকেও পেশার অঙ্গ হিসেবেই মনে করে!’

টিনা বলল, ‘লেডি জেমস বন্ড হওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই!’

কিটি হেসে ফেলে বলল, ‘আমার চেহারা যদি তোর মতো হত, তাহলে তোকে আর অনুরোধ করতাম না। সেক্স পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নেই। তোর ক্ষেত্রে ইশারাই কাফি হওয়া উচিত! আপাতত আমি এখন শুতে যাই। মগজাস্থেরও একটু বিশ্রাম পাওয়া দরকার! ঠিক সাড়ে ছ-টায় বেরোব আমরা।’

টিনা বলল, ‘কেন, অত আগে বেরোব কেন?’ কিটি হাই তুলে বেডরুমের দিকে যেতে যেতে উত্তর দিল, ‘ব্লু হেভেনে যাওয়ার আগে একবার সিটি সেন্টার ঘুরে যাব।’

ঠিক সন্ধ্য সাড়ে ছ-টার সময় বেরিয়ে পড়ল কিটিরা। কিটি পরেছে জিন্স-টি-শার্ট, টিনা কালো স্কার্ট-টপ। কিটি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, ‘তোকে যা লাগছে না! পুরো সেক্সকুইন!’

ফ্ল্যাটের নীচে নেমেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল তারা। ট্যাক্সি চলতে শুরু করার পর কিটি বলল, ‘দোকানের নামটা তখন অনিকেতের কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয়নি। একটা ফোন করতে হবে।’

মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে অনিকেতের নম্বর ডায়াল করল কিটি।

অনিকেত মনে হয় সেভ করে রেখেছিল কিটির নম্বরটা। কলটা রিসিভ করেই ও বলল, ‘হ্যাঁ ম্যাম বলুন...’

কিটি বলল, ‘সিটি সেন্টারের যে দোকান আপনাদের ব্রেজার সাপ্লাই যেয়, তার নাম কী?’

‘স্মার্ট লুক, গ্রাউন্ড ফ্লোর,’ অনিকেত জবাব দিল। কিটি ‘থ্যাক্স ইউ’ বলে লাইনটা কেটে দিল।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই সিটি সেন্টারের সামনে নামল কিটিরা। গ্লোসাইনের আলোতে বলমল করছে পুরো চত্বরটা। পার্কিং লটে বেশ কয়েকটা বাঁ-চকচকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ক-দিন পরই অবাঙালিদের একটা পরব আছে। তাই মনে হয় কেনাকাটার ভিড়। অবশ্য সন্দের সময় এমনিতেই লোকজন একটু বেশি আসা-যাওয়া করে এখানে। টিনা গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, ‘মাসিডিজ না হোক, এ-রকম গাড়িও যদি একটা কপালে জুটত!’

কিটি বলল, ‘আমার ন্যানো হলেই চলে যাবে।’ ভিতরে ঢুকে ‘স্মার্ট লুক’ খুঁজে-পেতে অসুবিধে হল না ওদের। দোকানটা বেশ বড়ো না হলেও সাজানো-গোছানো। প্রচুর ব্রেজার-সুট ঝোলানো আছে। একটা ছোটো ট্রায়াল রুমও আছে।

কয়েকজন খন্দের রয়েছে দোকানের মধ্যে। কাউন্টারে একটা ছেলে বসেছিল। কিটিরা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই সে ঝকঝকে হাসি হেসে বলল, ‘ইয়েস ম্যাডাম, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ?’

কিটি বলল, ‘গ্লোবাল প্রসপেক্ট কোম্পানিতে আপনারা যে ব্রেজার সাপ্লাই দিয়েছিলেন, তার বোতাম পাওয়া যাবে?’

লোকটা বলল, ‘সরি ম্যাডাম, ওটা এখনও আসেনি। এর আগেও আপনাদের কোম্পানির একজন স্যার দু-দিন, আর একজন ম্যাম একদিন ওই বোতাম খুঁজতে এসেছিলেন। দিতে পারিনি।’

ম্যাডামের কথা শুনে কিটি একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলল, ‘কোন ম্যাডাম বলুন তো? যে স্যার দু-দিন এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গেই একদিন যিনি এসেছিলেন, তিনিই তো?’

ছেলেটি বলল, ‘না। স্যার একদিন অন্য এক ম্যামকে নিয়ে এসেছিলেন।

আর এ ম্যামকে আমি চিনি। লম্বামতো। আমাদের দোকানে একবার ব্লেজার ট্রায়াল দিতেও এসেছিলেন।’

কিটি শুনে বলল, ‘ও, বুঝেছি। ঠিক আছে, আমি পরে কোনো সময় আসব’খন।’

দোকানের বাইরে এসে কিটি বলল, ‘এ তো এক নতুন সূত্র দিল।’

টিনা বলল, ‘এই দ্বিতীয় ম্যামটি নিশ্চয়ই সানা?’

কিটি বলল, ‘হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।’ তারপর রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘সবে সাতটা বাজে। অনেকটা সময় হাতে নিয়েই বেরিয়েছি, এখন কী করবি বল।’

টিনা কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, ‘এখানে যখন এলামই, তখন একটু উইন্ডো শপিং করেই যাই।’

ওরা দুজন ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। মাঝে মাঝে আশেপাশের দু-একজন আড়চোখে টিনাকে দেখছে, তা লক্ষ করে কিটি বলল, ‘তুই যেমন দোকান দেখছিস, লোকে কিন্তু তোকে দেখছে! পরে স্কার্টের বুলটা ইঞ্চি দুয়েক বাড়িয়ে নিস!’ টিনা বলল, ‘দেখতে দে। তার চেয়ে বেশি তো আর কিছু করছে না!’

ঘুরতে ঘুরতে একসময় ওরা সিঁড়ির সামনে আসতেই হঠাৎ কিটির চোখ পড়ল সিঁড়ি আর তার পাশের দেওয়ালের মাঝখানে একটা দোকানের উপর। এটাও ব্লেজারের দোকান বলেই মনে হল ওর। বেশ কয়েকটা ব্লেজার বুলছে। দোকানটা একদম কোনার দিকে। চট করে কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। কিটি দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল। দোকানের নাম, নিজামুদ্দিন। ভালো করে দেখতে বোঝা গেল, ওটা ব্লেজারেরই দোকান। একজন দাড়িওয়ালা, সাদা টুপি পরা মাঝবয়সি ভদ্রলোক আর একটা বছর দশেকের বাচ্চা ছেলে বসে রয়েছে কাউন্টারে। কিটি দোকানের সামনে গিয়ে প্রথমে ভালো করে দোকানটা দেখল। একটা কালো ব্লেজারও বুলছে এখানে। তবে গ্লোবাল প্রসপেক্টের ডিজাইনের নয়, অন্য রকমের। দাড়িওয়ালা লোকটার সঙ্গে কিটির চোখাচোখি হতেই লোকটা বলল, ‘বোলিয়ে ম্যাডাম?’

কিটি বলল, ‘জরা দেখিয়ে না, উয়ো কালো ব্লেজার কা বাটন মিলেগা?’

লোকটা বলল, ‘হাঁ জি, জরুর মিলেগা।’

কিটি বলল, ‘জরা দিখাইয়ে।’

লোকটা তার পিছনের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজের বাস্ক বের করে, তার ভিতরের একরাশ কালো বোতামের স্ট্রিপ কাউন্টারের উপর ঢেলে দিয়ে বলল, ‘আপ খুদ হি দেখ লিজিয়ে।’

কিটি দেখতে শুরু করল বোতামগুলো। একটু বেছে একটা বোতামের পাতা হাতে তুলে নিয়ে টিনার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ঠিক এ-রকমই, তাই না?’ তারপর লোকটার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, ‘প্রাইস কিতনা হ্যাঁই ইসকা?’

‘পার পিস টেন রুপিজ। লেকিন স্ট্রিপ লেনেসে, সিক্স বাটনস ফিফটি রুপিজ।’

লোকটার কথা শোনার পরই কিটির খেয়াল হল, ওর হাতে ধরা পাতাটায় পাঁচটা বোতাম। একটা বোতামসমেত তার নীচের অংশটা নেই। কিটি সঙ্গে-সঙ্গে পাতাটা লোকটাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল, ‘কেয়া আপ বতা সকতে হ্যাঁই, ইয়েওয়ালা বাটন কোন খরিদা থা?’

লোকটা কিটির অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। তারপর বলল, ‘নহি, মুঝে ইয়াদ নহি আ রহা!’

ঠিক তখনই পাশ থেকে বাচ্চা ছেলেটা বলল, ‘মুঝে মালুম হ্যাঁই। উসদিন হাম অকেলে থে দুকানপে। এক বহোত বুঢ়া আদমি আ কে উয়েওয়ালা বাটন খরিদা। পাঁচ রোজ পহলে শাম কো আয়া থা উয়ো।’

সেই লোকটা ঠিক কেমন দেখতে ছিল, বাচ্চাটাকে জিজ্ঞেস করলেও আর কিছু মনে করতে পারল না সে। কিটি ওই একটা বোতাম কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। প্রায় আটটা অবধি সিটি সেন্টারে ঘুরে-ফিরে ওরা রওনা হল পার্ক স্ট্রিটের উদ্দেশ্যে। রাত ন-টার বেশ কিছুক্ষণ আগেই ওরা পৌঁছে গেল পার্ক স্ট্রিটে। রাতের মোহময়ী পার্ক স্ট্রিট। আলো ঝলমলে সার সার দোকান, রেস্টুরাঁ।

বিশাল বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং থেকে আলোর দুতি ছড়িয়ে পড়ছে সারা রাস্তায়। ফুটপাথে নানা ধরনের লোক চলাচল করছে। তাদের চলাফেরার ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে, কেউ অফিস-ফেরতা, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার জন্য ছুটছে। কারো গতি মস্থুর। রাতের পার্ক স্ট্রিটের আমেজ উপভোগ করতে এসেছে তারা। কেউ কেউ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাচ্ছে ওদের দিকে। কী কারণে, তা বুঝতে

অসুবিধে হচ্ছে না তাদের। একজন তো পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা গাড়ির ভিতরে থেকে ওদের দিকে বাজে ইশারাও করে গেল। রেষ্টুরাঁগুলোর দরজা মাঝে মাঝে খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। ভিতর থেকে ভেসে আসছে লাউডস্পিকারের শব্দ। ফুটপাথ ধরে চারপাশ দেখতে দেখতে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছিল ওদের। হাঁটতে হাঁটতে একসময় ওরা পৌঁছে গেল একটা বন্ধ দরজার সামনে। তার মাথার ওপর নীল রঙের নিয়নে লেখা, ‘ব্লু হেভেন’। কিটি একবার তাকাল টিনার দিকে, তারপর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ঘড়ির কাটায় তখন ঠিক ন-টা বাজে।

ভিতরে পা রাখার সঙ্গেসঙ্গেই প্রথমে চোখে ধাঁধা লেগে গেল কিটিদের! সিলিং থেকে অনেকগুলো নীল আলো জ্বলছে-নিভছে। সার্চলাইটের মতো সেই তীর আলোগুলো ঘুরছে ঘরের চারদিকে। খুব জোরে ড্রাম বিট্‌সওয়ালা মিউজিক বাজছে। আওয়াজে কানে প্রায় তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়! সেই মিউজিকের সঙ্গে ঘরের ঠিক মাঝখানে গোল ডান্স ফ্লোরে তুমুল নাচছে জনাকুড়ি পুরুষ-মহিলা। নীলাভ আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাদের শরীর। মুহূর্তের জন্য ধরা পড়ছে উষ্ম দৃশ্যও!

কিটিরা দরজার একপাশে গিয়ে দাঁড়াল।

পরিবেশটা একটু বুঝে নেওয়ার পর খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল চারদিক। বিভিন্ন বয়সের জনাদশেক পুরুষ আছে ঘরের মধ্যে। সে নিজে না এলে তাকে চেনা সম্ভব নয়। মিনিট তিনেক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ওরা। একটু পরে একটা লোক ঘরের এক কোনার আলো-আঁধারি জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তাদের সামনে।

লোকটাকে দেখে কিটির মনে হল, তার বয়স বছর তিরিশ হবে। ক্রিকেটারদের মতো মেদহীন স্মার্ট চেহারা। পরনে গাঢ় রঙের জামাপ্যান্ট। লোকটা ওদের সামনে এসে দুজনকে একবার দেখে নিয়ে টিনার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ‘হাই, আয়্যাম অনিল কাপাডিয়া।’

টিনা হ্যান্ডশেক করে নিজের নাম বলল। এরপর কিটির সঙ্গেও হাত মিলিয়ে অনিল ওদের নিয়ে একটা সোফায় গিয়ে বসল। এই জায়গাটা আলোকবৃত্তের বাইরে, একটু অন্ধকার মতো। ইচ্ছা করেই সোফায় অনিলের পাশে বসল টিনা। টিনার পাশে বসল কিটি।

অনিল বলল, ‘আপনারা এ পেশায় এলেন কেন? আপনাদের তো গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার কথা!’

টিনা মোহিনী হাসি হেসে জবাব দিল, ‘এটা ঠিক আমাদের “পেশা” নয়, “প্যাশন”।’

অনিল বলল, ‘ওঃ প্যাশন! মানে, শখ! তা বলুন, কী জানতে চান আপনারা?’

টিনা বলল, ‘না, মানে, অফিসের সকলের সঙ্গেই কথা বলেছি। তাই আপনার সঙ্গেও কথা বলতে এলাম। আচ্ছা, কোম্পানিতে মি. সুরির পরই তো আপনার পজিশন, তাই না?’

অনিল কাপাডিয়া একটু হাসল। ওর মুখ থেকে হালকা অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

মুহূর্ত্থানেক চুপ করে থাকার পর অনিল বলল, ‘না, ঠিক পজিশনের ব্যাপার নয়! আসলে মি. সুরি আমার আঙ্কলের বন্ধু। ওঁর সঙ্গে আমাদের কোম্পানি কিছু ডিলও করে। তাই সুরিসাব আমাকে একটু ফেভার করেন। আঙ্কল আর সুরিসাবের মধ্যে লিয়াজঁর কাজটা অনেকসময় আমাকেই করতে হয়।’

টিনা বলল, ‘ওঁরও কি কম্পিউটার ফার্ম নাকি? কোথায় সেটা?’

‘না, পুরোপুরি কম্পিউটার ফার্ম বলা যাবে না। ওটা ডেটা সাপ্লাই কোম্পানি। কাজগুলো ওরা ধরে, আর গ্লোবাল প্রসপেক্ট কাজগুলো করে দেয়। অফিস শেক্সপিয়র সরণিতে। এ ছাড়া, আঙ্কলের আরও ব্যবসা আছে।’

কিটি বলুন, ‘আপনার আঙ্কল তো তাহলে বেশ বড়ো বিজনেসম্যান! ওঁর নাম বোধ হয় রাজেশ কাপাডিয়া, তাই না? মি. সুরি বলছিলেন।’

অনিল বলল, ‘হ্যাঁ। এই যে ডিস্কটা দেখছেন, এতেও ওঁর শেয়ার আছে। ওঁর হয়ে আমি এটা দেখাশোনা করি।’

টিনা অনিলের আর একটু গা ঘেঁষে বলল, ‘তাই নাকি? দারুণ ব্যাপার! আপনার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়েই গেল, তখন মাঝে মাঝে আসা যাবে এখানে। আপনি কি এখানে রোজই আসেন?’

অন্ধকারের মধ্যেও টিনার যেন মনে হল, ওর কথা শুনে অনিল কাপাডিয়ার চোখ চকচক করে উঠল! সে বলল, ‘ওঃ শিয়োর, নিশ্চয়ই আসবেন। রোজ

না এলেও, আমি প্রায়ই আসি এখানে। আসার আগে জাস্ট গিভ মি আ বাজ।’ বলার পরই হঠাৎ কী মনে হওয়ায় সে বলল, ‘আপনারা যে কারণে আমার কাছে এসেছেন, সে-ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করছেন না তো?’

কিটি বলল, ‘তেমন কিছু নয়। অফিস থেকেই যা জানার জেনেছি। বাকি ছিল আপনাকে দেখা। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, আপনার মতো চার্মিং মানুষ ওসব ব্যাপারে যুক্ত থাকতে পারেন না। লোক দেখলে আমরা বুঝতে পারি। তবে দুটো প্রশ্ন করতে চাই। এক, অ্যানির সঙ্গে অফিসে কারো কোনো চাপা অশান্তি হয়েছিল কিনা। দুই, আপনি অনিকেতকে ঠিক ক’টার সময় সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছিলেন?’

অনিল একটু হেসে বলল, ‘অশান্তি ছিল কি না জানি না। তবে সাড়ে সাতটার সময় আমার ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘরের ভিতরে সানা আর অ্যানির কথা কাটাকাটির শব্দ শুনেছি। তবে পুলিশকে কথাটা বলিনি। আর অনিকেতকে নামতে দেখি প্রায় আটটা কুড়ি হবে। আমি সেই মুহূর্তেই ওখানে গিয়েছিলাম। ওকে ছাদ থেকে নামতে দেখে খটকা লাগলেও, বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। পরে বোঝা গেল।’ এর পর একটু থেমে বলল, ‘পুয়ের বয়!’

একজন বেয়ারা ট্রেতে পানীয় ভরতি গ্লাস নিয়ে দাঁড়াল সোফার সামনে। অনিল টিনাদের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ড্রিন্‌কস?’

টিনা, কিটি দুজনেই বলল, ‘নো থ্যাঙ্কস।’

অনিল বলল, ‘সরি, এখানে লেমন জুসের ব্যবস্থা নেই। তবে জিন আছে। আমি অবশ্য হুইস্কিই প্রেফার করি। মাইন্ড ড্রিন্‌ক আমার চলে না।’ বলে ট্রে থেকে একটা গ্লাস তুলে, সেটা সঙ্গেসঙ্গে শেষ করে আবার ট্রেতে দিয়ে দিল অনিল।

কিটি জিজ্ঞেস করল, ‘অ্যানি কি খুব সুন্দর ছিল?’

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর পাশে বসে থাকা টিনার উন্মুক্ত উরুর দিকে তাকিয়ে অনিল কাপাডিয়া ঈষৎ জড়ানো স্বরে বলল, ‘একটা সেক্সি ব্যাপার ওর মধ্যে ছিল ঠিকই, কিন্তু আউটস্ট্যান্ডিং কিছু নয়। অস্তুত মিস টিনার মতো নয়!’ বলে ও তাকাল টিনার দিকে।

ওরা বুঝতে পারল, এবার ঘোর লাগতে শুরু করেছে ওর চোখে। কিটি

একটা মৃদু খোঁচা মারল টিনাকে। টিনা বুঝতে পারল ইঙ্গিতটা। ও অনিল কাপাডিয়া'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে এসে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। কোনো পার্টনার পাওয়া গেলে ডান্স করা যেত।'।

কথাটা শেষ করার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই অনিল উঠে দাঁড়িয়ে টিনার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ওর হাত ধরে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল টিনা। কিটি বসে রইল তার নিজের জায়গায়। টিনা অনিলের কোমর ধরে এগিয়ে গেল যেখানে সকলে নাচছে। কৌশলে টিনার শরীর ছোঁয়ার চেষ্টা করতে করতে অস্ফুট স্বরে তার প্রশ্নের জবাব দিতে থাকল অনিল কাপাডিয়া!

॥ ৪ ॥

সাধারণত ছ-টার মধ্যেই কিটি'রা দুজনেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। আগের দিন রাতে ফিরতে ফিরতে প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল। তারপর খাওয়া সেরে শুতে শুতে প্রায় সাড়ে বারোটা। টিনা যখন সকাল বেলা বিছানা ছেড়ে ড্রয়িং রুমে এল, তখন ঠিক সাতটা বাজে। টিনা দেখল মেঝেতে একগুচ্ছ খবরের কাগজ ছড়িয়ে বসে আছে কিটি। টিনার দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'আজ সারাদিন আমাকে কয়েকটা জায়গায় দৌড়ঝাঁপ করতে হবে। বেশ কয়েকটা খবর সংগ্রহ করতে হবে। ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়ব।' তারপর সামনে খুলে রাখা একটা খবরের কাগজ দেখিয়ে বলল, 'মি. সুরি বলেছিলেন, রাজেশ কাপাডিয়া'র কোম্পানি থিয়েটার রোডে। তখন মনে পড়েনি। কিন্তু কাল অনিল কাপাডিয়া রাস্তাটার পোশাকি নাম "শেক্সপিয়র সরণি" বলায় হঠাৎ মনে হল যে, শেক্সপিয়র সরণির কোনো একটা কোম্পানিতে কী-একটা ঘটনা যেন খবরের কাগজে দেখেছি। কোম্পানির নামটা মনে না থাকলেও 'কাপাডিয়া' নামটা খেয়াল ছিল। তবে সেই কাপাডিয়া যে এই কাপাডিয়া, তা পুরোনো খবরের কাগজ দেখে বুঝলাম।' কিটি একটা খবরের কাগজ হাতে তুলে দেখাল।

টিনা বলল, 'কী লেখা আছে পড় তো।'

কিটি বলল, 'দিন ছয়েক আগের রিপোর্ট। ছোটো করে তোকে বলছি। কাপাডিয়া ডেটা সার্ভিসের মালিক, রাজেশ কাপাডিয়া'র অ্যাকাউন্ট থেকে দিন সাতেক আগে কে যেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুড়ি লাখ টাকা বড়োবাজার



অঞ্চলের একটা ব্যাঙ্কের একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দেয়। তারপরই ওই টাকা সেখান থেকে তুলে নেওয়া হয়! ওই অঞ্চলের ব্যাঙ্কগুলোয় কুড়ি-পঁচিশ লাখ ট্রানজাকশন কোনো ব্যাপার নয়। ফলে ব্যাঙ্কেরও কোনো সন্দেহ হয়নি। টাকাটা ওরা পেমেন্টও করে দেয়। পুলিশ এনকোয়ারি করার পর যথারীতি জানা যায়, ওই অ্যাকাউন্টের মালিকের নাম-ঠিকানা ভুলো। ব্যাঙ্কের পেপার্সে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের যে ছবি আছে, তা বড়োবাজার অঞ্চলেরই এক রিকশাওয়ালার! তার তিন পুরুষের কারো কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না! পুলিশ এনকোয়ারির জন্য তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় বেচারার একদিনের রুটি-রুজি মার গিয়েছে!’

টিনা শুনে বলল, ‘ওই কেসের সঙ্গে অ্যানির কেসের কোনো সম্পর্ক আছে নাকি?’

কিটি বলল, ‘কোনো সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষত কোম্পানি দুটোর মধ্যে যখন ঘনিষ্ঠ একটা যোগাযোগ আছে!’ ওই খবরের কাগজটা আলাদা করে ভাঁজ করতে করতে কিটি বলল, ‘তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল সকাল একবার রাজদর্শনে যাব।’

‘রাজদর্শন মানে?’ টিনা প্রশ্ন করল।

কিটি উঠে বলল, ‘মানে, পুলিশের কাছে যাব! ওরাই তো দেশের রাজা! কেসটা যে থানায় আছে, তার ওসি-কে একটু আগে ফোনে ধরেছিলাম। লোকটার সঙ্গে আগে একবার পরিচয় হয়েছিল। কেসটার অফিসার ইন চার্জ, মি. সামন্তর সঙ্গে কথা বলব বললাম। সাড়ে আটটার মধ্যে যেতে বলল, তারপর নাকি সে বেরিয়ে যাবে।’

টিনা ব্রাশে পেস্ট লাগাতে লাগাতে বলল, ‘তুই সাতসকালেই কাজে লেগে গিয়েছিস দেখছি! তবে আমি ওই অনিল কাপাডিয়ার কাছে কিন্তু আর যেতে-টেতে পারব না। লোকটা যা-তা।’

কিটি বলল, ‘না, না, তোকে আর ওর কাছে যেতে হবে না। আমার জানার ইচ্ছে ছিল, কোম্পানির ভিতরে কোনো ঘোঁটলা আছে কি না। ডাম করার সময় ও তোকে যা বলেছে শুনলাম, তাতে তো তেমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। ওকে এর পরে আমিই হ্যান্ডল করব।’ ব্রেকফাস্ট করার জন্য কিচেনের দিকে পা বাড়াল কিটি।

রেডি হয়ে, ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোতে প্রায় আটটা বেজে গেল কিটিদের। ট্যান্সি নিয়ে ওরা ছুটল থানার দিকে। যখন থানায় পৌঁছোল তখন সাড়ে আটটা বাজে। ও সি-র ঘরে ঢুকতেই তিনি কিটিকে বললেন, ‘আগে পাশের ঘর থেকে কাজটা সেরে আসুন, সামস্ত ও ঘরেই আছে। ও আবার বেরিয়ে যাবে।’ তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কনস্টেবলকে ইশারা করলেন কিটিদের নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কিটিরা পাশের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল।

একজন মাঝবয়সি অফিসার টেবিলে বসে কিছু লিখছিলেন। কিটিরা ঘরে ঢুকতেই তিনি লেখা থামিয়ে কিটিদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘বসুন।’

তঁার মুখোমুখি চেয়ারে বসল কিটিরা। ইনস্পেকটর তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, বলুন। ওসিসাহেব আপনাদের কথা বলেছেন।’

কিটি কোনো ভণিতা না করে সোজা তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার কি মনে হয়, অনিকেত মিত্রই অ্যানিকে খুন করেছে?’

ইনস্পেকটর বললেন, ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ তো তাই বলছে। ওর ওই সময় ছাদে যাওয়া, ভিক্তিমের সেলফোনে মেসেজ পাঠিয়ে ছাদে ডাকা আর কেসটা যখন আপনারাও নিশ্চয়ই শুনেছেন যে, ভিক্তিমের হাতের মুঠোয় ওর ব্রেজারের বোতামও পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবত ধস্তাধস্তির সময় ওই বোতামটা মেয়েটার হাতের মুঠোয় এসেছিল। মেয়েটাকে ও ফেলে দিক বা মেয়েটা কোনোভাবে পড়ে যাক, ঘটনার সঙ্গে ছেলেটি জড়িত।’

কিটি মন দিয়ে শুনল ওঁর কথা। তারপর বলল, ‘ওর ব্রেজার-মোবাইল তো আপনারা সিজ করেছেন, বোতামটাও নিশ্চয়ই আছে আপনাদের কাছে। কাইভলি ওগুলো আমাকে দেখাবেন?’

ইনস্পেকটর একটু চুপ করে থেকে বললেন, ‘ঠিক আছে, দেখছি।’ উনি উঠে গিয়ে একটা স্টিলের আলমারি খুলে একটা বড়ো প্যাকেট নিয়ে এলেন। সেই প্যাকেট থেকে কালো ব্রেজারটা বের করে টেবিলের উপর রাখলেন। বোতামটা রাখা ছিল আর-একটা সেলফোন প্যাকের মধ্যে। সেটাও রাখলেন টেবিলের উপর।

কিটি জিনিসগুলোর দিকে এখবার তাকিয়ে বলল, ‘আপনার কাছে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস আছে?’

তিনি হেসে বললেন, ‘না ম্যাডাম নেই। ওসব আপনাদের মতো প্রাইভেট ডিটেকটিভ আর গল্প উপন্যাসের গোয়েন্দাদের লাগে। আমাদের চর্মচক্ষুই যথেষ্ট!’

ওঁর কথায় লুকিয়ে থাকা শ্লেষটা বুঝতে পারল কিটি। সেটা বেমালুম হজম করে, মিনিটখানেক ধরে ব্লেজার আর বোতামটা ভালো করে দেখল ও। তারপর পকেট থেকে আগের দিন কেনা বোতামটা বের করে টেবিলের বোতামটার পাশে রাখল। আরও মিনিটখানেক ধরে বোতাম দুটো আর ব্লেজারটার খুঁটিয়ে দেখে কিটি বলল, ‘এবার থেকে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস রাখার চেষ্টা করবেন। কারণ, ওটার সাহায্যে আমাদের মতো শখের ডিটেকটিভরা যা দেখতে পায়, আপনাদের অভিজ্ঞ চর্মচক্ষুতে তা ধরা পড়ে না!’

কিটির কথা শুনে ইনস্পেকটর সোজা হয়ে বসে বললেন, ‘মানে?’

সে বলল, ‘মানে হল, একজিবিট হিসেবে এই বোতাম আর ব্লেজারটা কোর্টে প্রোডিউস করে মামলাটা আপনি দাঁড় করাতে পারবেন না। আসামির বিরুদ্ধে আপনার প্রধান অস্ত্র বুমেরাং হয়ে আপনার দিকেই ফিরে আসবে! উলটে আসামি আপনার বিরুদ্ধে হ্যারাসমেন্টের মামলা করবে অথবা মানবাধিকার কমিশনে যাবে!’ মি. সামন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, ‘কী উলটোপালটা বকছেন?’

কিটি বলল, ‘উলটোপালটা বকছি না, সিঁজ করা বোতাম আর ব্লেজারের বোতামগুলো ভালো করে দেখুন।’

মি. সামন্ত টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন বোতামগুলো দেখার জন্য। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না।

কয়েক মুহূর্ত পর কিটি বলল, ‘এখনও ধরতে পারলেন না? ভালো করে দেখুন, অ্যানি গোমেজের হাতে ধরা বোতামটা আর ব্লেজারের বোতামগুলো একইরকম মনে হলেও, আসলে এক নয়।

ব্লেজারে বসানো বোতামের স্টিচ হোলগুলো রাউন্ড। আর সেলোফেন পেপারের মধ্যে রাখা বোতামটার স্টিচ হোল স্কোয়ার টাইপের। যার সঙ্গে শুধু মিল রয়েছে আমার রাখা বোতামটার।’

কিটি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বোতামটা তুলে নিয়ে বলল, ‘আমরা এখন চলি। তবে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করছি, অ্যানির মোবাইলে মেসেজটা কখন এসেছিল কাইন্ডলি বলবেন?’

মি. সামন্তর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। তিনি অশ্বুট স্বরে বললেন, 'ঠিক আটটায়।'

তাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কিটি টিনাকে নিয়ে ওসি-র ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মিনিট দশেক তাঁর ঘরে কাটিয়ে রিপোর্টিং আর সৌজন্যমূলক কথা সেরে বাইরে বেরিয়ে এল। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কিটি বলল, 'যাক, প্রথম ব্যাপারটা নিয়ে শান্তি হল। ভাবছিলাম, অনিকেত আমাদের ভুল দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না! ও যে অপরাধী নয়, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনিল কাপাডিয়াস অনিকেতকে ছাদ থেকে নামতে দেখা আর অ্যানির মোবাইলে মেসেজের ব্যাপারটা কোর্টে ধোপে টিকবে না।'

টিনা বলল, 'আসল অপরাধী তাহলে কে?' কিটি হেসে বলল, 'খোঁয়াশা অনেকটা কেটে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু এখনও সেটা বলার সময় আসেনি। খুনের মোটিভটা খুঁজে বের করতে পারলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। সেটাই এখন খুঁজে বের করতে হবে। অপরাধী সবসময়ই কিছু-না-কিছু চিহ্ন রেখে যায়। অতঃপর সেই চিহ্নগুলোর যথাযথ তাৎপর্য বিচার করা প্রয়োজন।' কথা শেষ করে কিটি একবার রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'ন-টা বেজে গিয়েছে। আমি আর এখন ফ্ল্যাটে যাব না। দশটায় গ্লোবাল প্রসপেক্ট খুলে যাবে। ওখানে একবার টুঁ মারব। তারপর আরও কয়েকটা জায়গায় যেতে হবে। তবে আশা করি, বিকেলের মধ্যেই ফিরতে পারব। তুই বরং বাড়ি ফিরে যা। অনিকেতকে বল, হাজার তিনেক টাকা তোকে দিয়ে যেতে। আর টেবিলের উপর অ্যানির যে বায়োডেটা আছে, তাতে ওর প্রিভিয়াস কোম্পানির ঠিকানা লেখা আছে। দেখ তো, ওদের টেলিফোন নম্বর বের করে বা ইন্টারনেটে কোনোভাবে যোগাযোগ করে অ্যানির সম্বন্ধে কোনো তথ্য সংগ্রহ করা যায় কি না। তেমন প্রয়োজন হলে আমাকে মোবাইলে ধরিস।'

টিনা বলল, 'ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করিস।'

কিটি একটা ট্যাক্সি দেখে এগিয়ে গেল আর টিনা ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। কিছুটা দূরে একটা অটোস্ট্যান্ড আছে। সেখানে শর্টকাটে যাওয়ার জন্য একটা সরু গলিতে ঢুকল টিনা। কয়েক পা এগোতেই পিছন থেকে বাইকের তীব্র হর্ন শুনে ঘাড় ফিরিয়ে ও দেখল, একজন হেলমেট পরা লোক

দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে আসছে। তাকে সাইড দেওয়ার জন্য টিনা রাস্তার একটু ধারে সরে গেল। মুহূর্তের মধ্যে বাইকটা এসে একটা শব্দ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল টিনার পাশে। আর সঙ্গেসঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ল টিনা! বাইকআরোহী কালো কাচ ঢাকা মুখটা একবার ফেরাল টিনার দিকে। তারপর একটা অশ্লীল গালাগালি দিয়ে কর্কশ স্বরে হিন্দিতে বলল, ‘সেক্টর ফাইভ মে মত যায়া করো। দোবারা মিলনেসে গোরি বদন পে অ্যাসিড ডাল দুঙ্গা!’ টিনা লাফিয়ে উঠল লোকটাকে ধরার জন্য। কিন্তু বাইকওয়ালা জোরে চালিয়ে বেরিয়ে গেল। টিনা একটু দৌড়োল ঠিকই, কিন্তু ওকে ধরতে পারল না। হাঁপাতে হাঁপাতে গায়ের ধুলো ঝেড়ে অটোস্ট্যান্ডে পৌঁছোল। তারপর অটো ধরে আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে গেল।

ঘরে ঢুকে টিনা প্রথমেই কিটিকে ফোন করে ব্যাপারটা জানাল। কিটি বলল, ‘তুই ঘাবড়াস না। আমার যে ঠিক পথে এগোচ্ছি, এ ঘটনা তার প্রমাণ। যে কাজগুলো বলেছি, সে-কাজগুলো কর। অ্যানির সম্বন্ধে ইনফো কালেক্ট করাটা কিন্তু খুবই ইম্পোর্ট্যান্ট। আমি কাজ শেষ করেই আসছি।’ টিনা জিজ্ঞেস করল, ‘তুই কি গ্লোবাল প্রসপেক্টে পৌঁছে গিয়েছিস?’ উত্তরটা শুনতে পেল না সে। সম্ভবত লাইনটা কেটে দিল কিটি। টিনা এবার কিটির কথামতো অনিকেতকে ফোন করে টাকা নিয়ে আসতে বলল। টিনা এরপর ফ্রেশ হয়ে অ্যানির বায়োডেটা নিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসল। মিনিট চল্লিশের মধ্যেই ডোর বেলের শব্দে দরজা খুলে ও দেখল, অনিকেত এসেছে। ভিতরে ঢুকে সোফায় বসার পর পকেট থেকে একটা খাম বার করে অনিকেত টেবিলের ওপর রাখল।

তারপর বলল, ‘জানেন, আজ সকালে সানা রয় ফোন করেছিল। ও বলল যে, আমি যদি ওর প্রস্তাবে রাজি হই, তাহলে ও পুলিশের কাছে স্টেটমেন্ট দেবে যে, আমার ব্রেকারের বোতামটা যে ক-দিন ধরেই ছিল না তাও দেখেছিল। আর সেদিন আটটা থেকে সাড়ে আটটা যে আমি ওর সঙ্গে ওর ঘরেই ঘনিষ্ঠভাবে কাটিয়েছিলাম, তা-ও বলবে। এই স্টেটমেন্টের জন্য চাকরি খোয়াতেও ও নাকি রাজি! শুধু আমি “হ্যাঁ” করলেই হল!’

ওর কথা শুনে টিনা বলল, ‘মেয়েটা আপনাকে সত্যিই ভালোবাসে বলে মনে হয়! ঠিক আছে, আপনি যখন এসেই গিয়েছেন, তখন দেখুন তো আমাকে

একটু হেল্প করতে পারেন কি না! অ্যানি আগে যে কোম্পানিতে কাজ করত, তাদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করা প্রয়োজন। ইন্টারনেটে চেষ্টা করছি, কিন্তু ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারছি না। এসব ব্যাপারে তো আপনারা অভিজ্ঞ।’

অনিকেত বলল, ‘চেষ্টা করে দেখতে পারি।’ তারপর চারপাশে একবার তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ‘ক্যাটরিনা ম্যাডাম নেই?’

টিনা একটু মুচকি হেসে বলল, ‘না, নেই। কেন, আমাকে কি ঠিক আপনার পছন্দ হচ্ছে না?’

অনিকেত একবার চোখ তুলে তাকাল টিনার দিকে। তারপর লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে টিনার খেয়াল হল, স্কার্টের উপর শুধু পাতলা সুতির গেঞ্জি পরে আছে ও। অনিকেতকে একটু অপেক্ষা করতে বলে গায়ে কিছু চাপানোর জন্য ঘরে চলে গেল টিনা। মিনিটখানেকের মধ্যেই ফিরে এসে ওকে নিয়ে বসে গেল কম্পিউটারের সামনে। ঘণ্টাদেড়েক ধরে চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত অনিকেত যোগাযোগ করতে পারল ‘এথিক্স’-এর সঙ্গে। খুব বেশি কিছু না জানা গেলেও, এটুকু জানা গেল যে, ওই কোম্পানিতে এথিকাল হ্যাকারের কাজ করত অ্যানি। এ ব্যাপারে সে নাকি বেশ দক্ষও ছিল। ‘এথিকাল হ্যাকার’-এর মানেও অনিকেতের থেকে জেনে নিল টিনা।

অনিকেত যখন ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরোল তখন প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। আর কিটি ফিরল প্রায় সাড়ে চারটে নাগাদ। ঘরে ঢুকেই ধপ করে সোফায় বসে পড়ে ও বলল, ‘আগে এক গ্লাস জল দে। কলকাতার এ মাথা থেকে ও মাথা চক্কর দিতে হল!’

টিনা জল এনে দিল। জল খেয়ে কিটি বলল, ‘অনিকেত এসেছিল? টাকা দিয়ে গিয়েছে?’

টিনা বলল, ‘হ্যাঁ, ওই যে, খামের মধ্যে আছে।’

‘ধাক্কা খেলি, তোর কোথাও লাগেনি তো?’

‘গোড়ালির কাছে ছুড়ে গিয়েছে শুধু। বাই দ্য ওয়ে, গ্লোবাল প্রসপেক্টে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নতুন কিছু জানতে পারলি?’

কিটি বলল, ‘অনিল কাপাডিয়া অফিসে আসেনি। হ্যাংওভার কাটেনি মনে হয়! অন্য তিনজনের সঙ্গেই কথা বললাম। তবে মেনলি সানা রয় আর সঞ্জীব বসুর সঙ্গে দেখা করব বলেই গিয়েছিলাম।’

‘কিছু বুঝলি?’

‘এখনও সব ক্লিয়ার নয়,’ সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বলল কিটি, ‘পুরো কেসে একমাত্র সুরিরই খাঁটি অ্যালিবাই আছে। ঘটনার সময় উনি উপরে ছিলেন না। অনিকেত আর অনিলের বক্তব্যে সেটা ভেরিফাই করা গিয়েছে। অনিল ওঁকে নীচে নামতে দেখেছে আর অনিকেত নিজে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় ওঁকে নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। অনিকেত নিজে কাজটা করেনি। কারণ, সে বিল্ডিঙে ঢোকার মুহূর্তে অ্যানিকে ছাদে দেখেছে। ঘটনাটা সম্ভবত ঘটানো হয় বিল্ডিঙে ঢুকে ছাদে যেতে অনিকেতের যে সময়টুকু লেগেছিল, তার মধ্যে। সেসময় উপরে ছিল তিনজন। তাদের তিনজনেরই কিন্তু ঘটনাটা ঘটাবার সুযোগ এবং কারণ আছে। প্রথমেই অনিল কাপাডিয়ার কথা ধর। লোকটা ক্ষমতাবান এবং লম্পট। সে আগে অ্যানিকে প্রপোজ করেছিল। বলা বাহুল্য, তা বিয়ে করার জন্য নয়। স্নেফ মজা লোটার জন্য। এমন হতে পারে যে, ও-ই অনিকেতের ফেলে যাওয়া মোবাইল থেকে অ্যানিকে মেসেজ পাঠায়! অ্যানি ছাদে ওঠার পর ও-ও ছাদে যায়, তারপর অ্যানিকে জোর করতে গিয়ে বা অন্য কোনো কারণে ব্যাপারটা ঘটায়। ও-ই কিন্তু পুলিশকে অনিকেতের ব্যাপারে স্টেটমেন্টটা দিয়েছে। এটা একটা ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার। যে অপরাধ করে, সে সবসময় চেষ্টা করে পুলিশের দৃষ্টি অন্যের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার। ও-ই বা হঠাৎ সিঁড়ির সামনে ওই মুহূর্তে গিয়ে দাঁড়াল কেন?’ একটু থামে কিটি। তারপর বলে, ‘যদি কাজটা ও করে থাকে, তবে তার পিছনে অনিলের অন্য কোনো মোটিভও থাকতে পারে। সে-সম্ভাবনাও আমি এখনই উড়িয়ে দিচ্ছি না। এবার ধর, সানা রয়ের ব্যাপার। অনিকেতকে ও প্রপোজ করেছিল...’

টিনা কিটিকে থামিয়ে বলে, ‘তোকে তো বলাই হয়নি। আজ সানা অনিকেতকে ফোন করে বলেছে, ও যদি সানার প্রস্তাবে রাজি হয়, তাহলে সানা অনিকেতের ফেভারে পুলিশকে স্টেটমেন্ট দেবে। সেজন্য ও চাকরি খোঁয়াতেও রাজি!’

কিটি বলল, ‘আমিও এটাই বলতে যাচ্ছিলাম। সানা ওকে ভীষণভাবে চায়। এ ধরনের চাওয়া অনেক সময় ভয়ংকর রূপ নিতে পারে। অ্যানির সঙ্গে অনিকেতের মেলামেশাটা চোখে পড়েছিল সানার। অ্যানির প্রতি ওর ঈর্ষা

জন্মানো স্বাভাবিক। অনিল কাপাডিয়া কাল অ্যানির সঙ্গে সানার তর্কাতর্কির যে শব্দ শুনেছে বলছিল, সে-ঘটনা কিন্তু সত্যি। সানা আজ তা স্বীকার করেছে। ওর ধারণা, অনিকেত আর অ্যানির মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এই নিয়ে সেদিন তর্ক হয় দুজনের মধ্যে। সানার কথা অনুযায়ী, অ্যানি অবশ্য স্বীকার করেনি ব্যাপারটা। খেয়াল রাখতে হবে যে, সত্যিই হোক বা মিথ্যে, এর আগেও স্বামীকে হত্যা করার একটা অভিযোগ সানার বিরুদ্ধে উঠেছিল। এমন হতেই পারে, সানাই অ্যানিকে ছাদে যাওয়ার জন্য মেসেজ পাঠায় এবং তারপর খুনটা করে। মেসেজ পাঠানোর সুযোগটা কিন্তু ওরই বেশি ছিল। অনিকেতের মোবাইলটা কিন্তু ও একবার হাতে নিয়েছিল! তা ছাড়া ও সিটি সেন্টারের দোকানে ব্লজারের বোতাম খুঁজতে গিয়েছিল কেন? নিজামুদ্দিন থেকে অন্য কাউকে দিয়ে বোতাম কিনে এনে ও ডেডবন্ডির হাতে গুঁজে দেয়নি তো?’

টিনা বলল, ‘তুই এটা জিজ্ঞেস করেছিলি ওকে?’

কিটি জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, করেছিলাম। সানা বলেছে, ও অনিকেতের জন্যই নাকি ওটা কিনতে গিয়েছিল। ব্লজারের একটা বোতাম যে নেই, সেটা ও খেয়াল করেছিল দু-দিন আগে। অনিকেতের প্রতি ওর কত মনোযোগ, সেটা তাকে দেখবার জন্যই নাকি বোতামটা কিনে ওকে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল সানার!’

টিনা বলল, ‘আর তৃতীয় জন?’

একটু চুপ করে কিটি বলল, ‘তৃতীয় জন অর্থাৎ সঞ্জীব বসুর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড খুব অদ্ভুত। ও যেখানে থাকে, সেখানে আমার পরিচিত একজন থাকে। তাকে টেলিফোন করে ব্যাপারটা জানলাম। ওর বাবা পাগল ছিলেন। ভাইও পাগল। কয়েকটা মিসহ্যাপ হয়েছে ওদের ফ্যামিলিতে। বছর পনেরো আগে ওর বাবা স্ত্রীকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেন। পাঁচ বছর আগে ওর ভাইও একই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বরাতজোরে মেয়েটা বেঁচে যায়। সঞ্জীব বসুর ভাই এখন দমদমে অ্যাসাইলামে থাকে। এমনিতে সঞ্জীব বসুকে স্বাভাবিক মনে হলেও, নারীবিদ্বেষের ব্যাপারটা যদি বংশগত কারণে ওঁর রক্তেও থাকে, তাহলে উনিও অ্যানির ঘটনাটা ঘটাতে পারেন। জটিল মানসিক রোগের কারণেও অনেক সময় এই রোগীরা অকারণে মানুষ খুন করে। এই আশঙ্কাও একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না!’

টিনা শুনে বলল, ‘এদের কাউকেই তো তাহলে সন্দেহর বাইরে রাখা যাচ্ছে না দেখছি!’



‘ঠিক তাই। এবার বল, “এথিক্স”-এর ব্যাপারটা কী হল? কোনো ইনফো পেলি?’

টিনা জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, যোগাযোগ করেছিলাম। এ ব্যাপারে অনিকেত খুব সাহায্য করেছে। বলতে পারিস, আমার কম্পিউটারে বসে ও-ই আসলে যোগাযোগটা করেছে। তবে ওর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানা যায়নি। ওই কোম্পানির হয়েও অ্যানি এথিকাল হ্যাকারের কাজ করত। ওই কাজে নাকি ও বেশ দক্ষ ছিল। “এথিক্স” কোম্পানি ওই কাজই করে।’

কিটি বলল, ‘হ্যাকার’ যোগ হল কেন? এই শব্দটা তো জানা ছিল না! এটার মানে কী?’

টিনা বলল, ‘শব্দটা আমারও জানা ছিল না। সাইবার মার্কেটে এই শব্দ আর পেশাটা নতুন চালু হয়েছে। অনিকেতই ক্লারিফাই করল। কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড ব্রেক করে কোনো ফাইলে ঢুকে হ্যাকাররা ইনফো কালেক্ট করে, এটা তো তুই জানিসই। আমরা সাধারণত যে পাসওয়ার্ড তৈরি করি, তা ব্রেক করতে হ্যাকারদের দু-মিনিটও সময় লাগে না! কিন্তু বড়ো বড়ো কোম্পানি, ফিনানশিয়াল প্রতিষ্ঠান বা ডিফেন্সের ক্ষেত্রে এই সিকিউরিটি কতটা মজবুত, তা পরীক্ষা করার জন্য এথিকাল হ্যাকাররা ওসব পাসওয়ার্ড ব্রেক করার চেষ্টা করে। তারপর সে-ব্যাপারে সার্টিফিকেট দেয়। অনেকে এদেরকে “হোয়াইটহ্যাট হ্যাকার” নামেও ডাকে।’

কিটি শুনে বলল, ‘এ ব্যাপারটা তো আমার জানা ছিল না!’ কিছুক্ষণ কী-একটা চিন্তা করার পর কিটি বলল, ‘আচ্ছা, যে লোকটা তোকে থ্রেট করল, তার ফিগারটা কি গ্লোবাল প্রসপেক্টের কারো সঙ্গে ম্যাচ করে?’

কিটি জবাব দিল, ‘খুব ভালো করে বুঝে ওঠার সময় পাইনি। তবে অনিল কাপাডিয়া বা সঞ্জীব বসুর সঙ্গে ম্যাচ হলেও হতে পারে। গলাটা তো চেন্জ করাই যায়।’

কিটি বলল, ‘সম্ভবত ভাড়াটে গুন্ডাই হবে। সামনাসামনি এত রিস্ক কেউ নেবে না।’

টিনা বলল, ‘আমি তখনই উঠে পড়েছিলাম। পিছনে দৌড়েও ছিলাম। কিন্তু যন্ত্র তো মানুষের চেয়ে দ্রুত ছোটো...’

হঠাৎ সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে কিটি টিনাকে

বলল, ‘আমি এখনই একবার বাইরে যাব। ফিরতে দেরি হলে খেয়ে নিস।’

টিনা অবাক হয়ে বলল, ‘সে কী রে! এই তো এইমাত্র ফিরলি! আবার কোথায় যাবি?’ কিটি কোনো উত্তর না দিয়ে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

ও যখন বাড়ি ফিরল, তখন প্রায় রাত দশটা বাজে। টিনার সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে, খাওয়া সেরে শুতে যাওয়ার আগে শুধু বলে গেল, ‘কাল সাতটার মধ্যে উঠিস। কাজ আছে।’

টিনাও ওকে আর বিরক্ত করল না। কারণ, কিটি যখন গভীরভাবে কোনো কিছু চিন্তা করে, তখন সে জিজ্ঞেস করলেও কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয় না! টিনা বুঝল, কিটি এখন সেই স্টেজে আছে।

পরদিন সাতটার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে পড়ল টিনা। ড্রয়িং রুমে এসে দেখল, সোফায় বসে কিটি একটা বই পড়ছে। ব্রাশে পেস্ট লাগাতে লাগাতে টিনা বলল, ‘কখন উঠলি?’

কিটি গভীরমুখে জবাব দিল, ‘মাঝরাতে।’

টিনা অবাক হয়ে বলল, ‘মাঝরাতে মানে?’

কিটি হেসে জবাব দিল, ‘মাঝরাতে মানে মাঝরাতে। আসলে মাথার মধ্যে নানারকম চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল তো! তাই শোয়ার ঘন্টা তিনেক পরই হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। তারপর বাকি রাতটা এই বইটা পড়লাম। প্রায় শেষ করে এনেছি,’ বলে ও তুলে দেখাল বইটা।

টিনা নামটা দেখল, ‘দ্য বাইবেল অব হ্যাকিং।’

ও বলল, ‘এটা আবার কখন পেলি?’

‘কাল সানার থেকে নিছক কৌতূহলবশতই এনেছিলাম। পড়ে দেখছি, সত্যি কাজের বই। মনের একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল।’ এর পর একটু হেসে বলল, ‘অবশ্য, আসল দরজাটা তুই-ই কাল খুলে দিয়েছিস।’

টিনা বলল, ‘মানে?’

কিটি বলল, ‘মানেটা সময়মতো বলব। আচ্ছা, আমাদের ফ্ল্যাটের থার্ড ফ্লোরের নীলাঞ্জন বলে যে ছেলেটাকে পরশু কুইন্স ম্যানসনের ছাদে দাঁড়িয়ে পাশের বিল্ডিংয়ে কাজ করতে দেখলাম, সে কি হেলপফুল?’

টিনা বলল, ‘মনে হয়। দুর্গাপূজার সময় কালচারাল ফ্যাশনটা তো ও-ই অর্গানাইজ করে। আমি কয়েকবার কথা বলেছি। ব্যবহারটা ভালো।

আমাদের পেশার কথা ও জানে। একদিন বলছিল, এসব ব্যাপারে ও-ও নাকি ইন্টারেস্টেড। ক্রাইম থ্রিলারও নাকি খুব পড়ে।’

কিটি শুনে বলল, ‘বাঃ, ভালো হল। ব্রাশ করা হয়ে গেলে তুই ওর ওখানে একবার যা। ওকে বল, একটা কেসের ব্যাপারে ওর সাহায্য চাই। যদি রাজি হয়, তাহলে আমি কথা বলতে যাব।’

টিনা বলল, ‘ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।’

নীলাঞ্জনের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসতে টিনার মিনিট কুড়ি লাগল। কিটি ততক্ষণে স্নান সেরে একদম রেডি। কফি বানানোও হয়ে গিয়েছে। টিনা ঘরে ঢুকতেই কিটি তার দিকে কফির মগ এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘কী রে কী বলল?’

টিনা বলল, ‘তদন্তে সাহায্য করতে হবে শুনেই এককথায় রাজি হয়ে গিয়েছে। আমি অবশ্য কী কেস, তা বলিনি। তোর জন্য অপেক্ষা করছে।’

কিটি বলল, ‘শোন, এখন একেবারে বাইরে যাচ্ছি। নীলাঞ্জনের ফ্ল্যাট হয়ে অন্য কাজে যাব। বিকেলের মধ্যেই ফিরব। তারপর তোকে নিয়ে বাইরে যেতে হবে। চিন্তা করিস না, ক্লাইম্যাক্সে তুই আছিসই।’

কফি শেষ করে বেরিয়ে গেল কিটি। ও চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে সোফায় শুয়ে কিছুক্ষণ অ্যানির বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল টিনা। তারপর ভালো না লাগায় বইটা রেখে দিয়ে কোনো মেল এসেছে কি না দেখার জন্য কম্পিউটারের সামনে বসতে যাবে, ঠিক সেইসময় ডোর বেল বেজে উঠল। টিনা আই হোলে চোখ লাগিয়ে দেখল, অনিকেত দাঁড়িয়ে আছে।

টিনা দরজা খুলে দাঁড়াতেই অনিকেত বলল, ‘কাল বিকেলের পর কোনো খবর পেলাম না। তাই সকাল বেলাই চলে এলাম।’

টিনা বলল, ‘কিটি আজও বেরিয়ে গেছে। ওকে কিন্তু পাবেন না।’

অনিকেত বলল, ‘আপনি তো আছেন!’

টিনা দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, ‘ভিতরে আসুন।’

আগের দিনের মতোই আজও চারটে নাগাদ ফিরল কিটি। পরিশ্রান্ত হলেও ওর মুখ যে চকচক করছে, তা দেখেই বুঝতে পারল টিনা। সোফায় বসে

জল খেয়ে একটু ঠান্ডা হওয়ার পর কিটি বলল, ‘খাবার-টাবার কিছু আছে? খুব খিদে পেয়েছে। একবার স্নানও করব। গা-হাত ধুলোয় চিটচিট করছে! তুই কিন্তু ছ-টার মধ্যে রেডি হয়ে নিস। ডট ছ-টায় বেরোব। আর একটা কথা, কালো অথবা গাঢ় রঙের কোনো পোশাক পরিস।’

টিনা কালো পোশাকের কথা শুনে বলল, ‘আজও কি তোর গন্তব্য রু-হেভেন?’

কিটি সিরিয়াস মুখ করে বলল, ‘না, স্টেডিয়ামের ওদিকে যাব। আর কালো ড্রেস বলতে তোর কালকের ড্রেসের কথা বলছি না। ওই ড্রেস চলবে না। টাইট ফিটিংস ডার্ক শার্ট-প্যান্ট হলে ভালো হয়। এমন ড্রেস যা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়!’

॥ ৫ ॥

ঠিক ছ-টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে টিনাকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে কিটি ড্রাইভারকে বলল, ‘পার্ক সার্কাস যাব।’ টিনা একটু অবাক হল।

ওদের তো স্টেডিয়ামের দিকে যাওয়ার কথা! ও অবাক হয়ে তাকাল কিটির মুখের দিকে। ওর মুখ গভীর। ও যে খুব উত্তেজিত, তা বুঝতে পারল টিনা। ও আর কোনো কথা বলল না।

ট্যাক্সি কিন্তু পার্ক সার্কাস পর্যন্ত গেল না।

মিনিট দশেক পর রাস্তার পাশে একটা গলি দেখে সেখানে ড্রাইভারকে গাড়ি ঢোকাতে বলল কিটি। ড্রাইভার গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে একটু এগোতেই তাকে ট্যাক্সি থামাতে বলল ও। তারপর ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করল।

টিনা এবার ওকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুই ঠিক কোথায় যাবি বল তো?’

কিটি হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘স্টেডিয়ামের ওখানেই যাব।’

টিনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘তাহলে এখানে এলি কী করতে?’

‘ধোঁকা দেওয়ার জন্য! কেউ যদি আমাদের ফলো করে, তাহলে যাতে সে আমাদের মুভমেন্ট ট্রেস আউট না করতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। বাইক নিয়ে যে তোকে খেঁট করল, সে নিশ্চয়ই আমাদের ফলো করছিল।’

টিনা বুঝতে পারল ব্যাপারটা। এর পর আরও দু-বার ট্যাক্সি বদল করল

ওরা। শেষ ট্যাক্সিটা সাড়ে সাতটা নাগাদ ওদের স্টেডিয়ামের কাছাকাছি একটা জায়গাতে নামিয়ে দিল। এদিকটা স্টেডিয়ামের পিছন দিক। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। একটু এগিয়ে কিটি ফুটপাথ ছেড়ে নেমে রাস্তার পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা পায়ে চলা পথ ধরল। তার একপাশে ঝোপজঙ্গল, অন্য পাশে স্টেডিয়ামের পাঁচিল। ঝোপের আড়ালে নোংরা আবর্জনার মধ্যে দিয়ে বেশ খানিকটা এগোবার পর একসময় দাঁড়িয়ে পড়ল কিটি। তারপর ঝোপের আড়াল থেকে বাইরের দিকে তাকাল। টিনাও তাকাল বাইরের দিকে। ঝোপের বাইরে কয়েক হাত দূরেই ফুটপাথ। তারপর রাস্তা। হাত পনেরো দূরেই একটা ল্যাম্পপোস্ট। সোডিয়াম ভেপারের আলোটিয় কোনো জোর নেই, ফ্যাকাশে হলদেটে। টিনার হঠাৎ চোখে পড়ল, ল্যাম্পপোস্টের নীচে একটা লোক তাদের দিকে পিছন ফিরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিট তিনেক পর একটা পথচলতি গাড়ির আলো লোকটার মুখের এক পাশে এসে পড়ায় ওকে চিনে ফেলল টিনা। ও তো নীলাঞ্জন! এখানে কার জন্য অপেক্ষা করছে? টিনা তাকাল কিটির দিকে। কিটি ঠোটে আঙুল দিয়ে টিনাকে চুপ করে থাকতে বলল। তারপর একবার ঘড়িটা দেখে নিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রাখল। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কিটির মুখে কোনো কথা নেই। চোখ রাস্তার দিকে।

ল্যাম্পপোস্টের নীচে নীলাঞ্জনও একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা রাস্তা। কোনো লোকজন নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা গাড়ি বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে হেডলাইট জ্বলে। ঠিক আটটা নাগাদ একটা গাড়ি হঠাৎ উলটোদিকের ফুটপাথের পাশ দিয়ে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর গাড়ির মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তা ক্রস করে এপাশে এসে ল্যাম্পপোস্টের দিকে একটু এগিয়ে ইচ্ছে করেই যেন হেডলাইটের আলোটা নীলাঞ্জনের গায়ে ফেলল। কয়েক মুহূর্ত পর হেডলাইটের আলো নিভে গেল। গাড়িটা আরও কয়েক হাত এগিয়ে ল্যাম্পপোস্টের আরও কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। কিটি মৃদু চাপ দিল টিনার হাতে!

নীলাঞ্জন তাকিয়ে আছে গাড়িটার দিকে। মারুতি জেন গাড়িটার দরজাটা খুলে গেল। একটা লোক গাড়ি থেকে নেমে প্রথমে চারপাশে তাকাল।

তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল নীলাঞ্জনের দিকে। ল্যাম্পপোস্টের আলোটা একঝলক পড়ল লোকটার মুখের উপর। ওর মুখ চেনা গেল না। সম্ভবত,

মুখোশ বা কোনো ফেট্রি বাঁধা আছে মুখে। লোকটা নীলাঞ্জনের কাছে এসে কী যেন বলল ওকে। সে-ও কী-একটা জবাব দিল।

লোকটা যেন এরপর কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে তার প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকাতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তের চারপাশের নৈঃশব্দ্য ভেঙে তীব্র স্বরে খুব কাছ থেকে বেজে উঠল পুলিশের হুইসল। সঙ্গেসঙ্গেই চার-পাঁচজন পুলিশকর্মী যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে ঘিরে ধরল লোকটাকে! কিটিও ঠিক সেই মুহূর্তে ঝোপ উপরে ছুটে গেল সেদিকে। টিনাও ওকে অনুসরণ করল।

চারটে রিভলভারের ঘেরাটোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা থাকলেও সে যে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে, তা বুঝতে পারল টিনা। একজন পুলিশকর্মী লোকটার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘পকেট থেকে হাত বের করার একদম চেষ্টা করবেন না।’ তাঁকে চিনতে পারল টিনা, ইনস্পেকটর সামন্ত। একজন পুলিশকর্মী ফেট্রি বাঁধা লোকটার পকেট থেকে কী-একটা বের করে নিল। সম্ভবত কোনো অস্ত্র। কিটি লোকটার একদম মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, ‘মুখ থেকে কাপড়টা নিজেই খুলবেন, নাকি আমরা খুলে দেব?’

লোকটা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিটির দিকে, তারপর নিজেই ফেট্রিটা খুলে ফেলল। কিটিদের টিনা অবাক হয়ে দেখল, ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মি. সুরি!

ফেট্রিটা খোলার পর মি. সুরি কিটির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, ‘এসব কী হচ্ছে? পুলিশ আমার রিভলভার নিল কেন? ওটা আমার লাইসেন্সড রিভলভার!’

কিটি একটু হেসে ঠান্ডা গলায় বলল,

‘রিভলভারের লাইসেন্স আপনার থাকতে পারে কিন্তু মিস অ্যানিকে মার্ডার করার লাইসেন্স আপনার ছিল কি?’

মি. সুরি প্রথমে একটু জোর গলায় বললেন, ‘কী যা-তা বকছেন আপনি?’ তারপর একটু থেমে একটা বাঁকা হাসি হেসে বললেন, ‘আর সেটা যদি সত্যিই হয়, তবে তা আদৌ কোর্টে প্রমাণ করতে পারবেন তো?’

কিটি বলল, ‘তা কোর্টেই দেখা যাবে। তবে আরও একটা বড়ো চার্জও আপনার বিরুদ্ধে আছে। সেটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে যাবে। ফাঁসি না হোক, তার জন্য জেল কিন্তু অবশ্যই লেখা আছে আপনার কপালে। অন্তত তার মেয়াদ দশ বছর!’

মি. সুরি একটু অবাক হয়ে বললেন, ‘কী চার্জ?’

কিটি ঠান্ডা গলায় বলল, ‘চার্জটা হল কাপাডিয়া ডেটা সার্ভিসের মালিক রাজেশ কাপাডিয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে কুড়ি লাখ টাকা ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা আর তারপর সেই টাকা ভুয়ো সই করে তুলে নেওয়া। ওই সইটা যে আপনারই, তা ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্টরা সহজেই প্রমাণ করে দেবেন। অ্যানিকে দিয়েই আপনি কাপাডিয়ার কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড ব্রেক করিয়ে ছিলেন। তারপর সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপাটের জন্য তাকে সরিয়ে দিলেন পৃথিবী থেকে।’

মি. সুরির চোয়ালটা এবার ঝুলে পড়ল। ইতিমধ্যে পুলিশের একটা জিপ এসে দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়।

কিটির কথা শোনার পর মি. সুরি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সে-সুযোগ না দিয়ে একজন অফিসার তাঁকে নিয়ে গেলেন জিপের দিকে।

কিটি নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘উই আর গ্রেটফুল টু ইউ।’

ড্রয়িং রুমের সোফায় পাশাপাশি বসে ডিনার করছিল কিটিরা। একটু আগেই ওরা বাড়ি ফিরেছে। টিনা কিটিকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুই কী করে বুঝলি যে, মি. সুরিই আসল অপরাধী?’

‘ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি। মি. সুরির খাঁটি অ্যালিবাই ছিল বলে ওঁকে প্রথমে একটু কম সন্দেহ করেছিলাম। সাক্ষ্য-প্রমাণ অনুযায়ী, ঘটনার সময় উনি নীচেই ছিলেন। রাজেশ কাপাডিয়ার ব্যাপারটা জানার পর থেকেই কেন জানি বার বার মনে হচ্ছিল, অ্যানির মৃত্যুর সঙ্গে ওই ঘটনার একটা সম্পর্ক আছে! কাল অ্যানির পেশা শোনার পর, আর বিশেষত তোর ওই কথাটা, ‘যন্ত্র তো মানুষের চেয়ে দ্রুত ছোটো’ শোনার সঙ্গেসঙ্গেই মনে অন্য চিন্তা ঝিলিক দেয়। অনিকেত যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে, তখন আটটা দশ। উপরে উঠে ঘর থেকে মোবাইল নিয়ে ছাদের সিঁড়ির কাছে আসতে ওর কমপক্ষে মিনিট সাতেক সময় লেগেছিল। এমনও তো হতে পারে, নীচ থেকে ওই সময়ের মধ্যে...তোর কথা শুনেই কাল বিকেলে আবার ছুটি কুইন্স ম্যানসনে। ওখানে ভালো করে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, লিফ্ট আসলে ঠিক হয়েছিল ঘটনার দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সঙ্গে নাগাদ! অনিকেত কিন্তু

মি. সুরিকে লিফ্টের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল! অর্থাৎ মি. সুরিকে কোনো অবস্থাতেই সন্দেহের বাইরে রাখা যায় না। তখন ওঁকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। অ্যানির ডেডবডি উনিই প্রথম দেখেছিলেন। মি. সুরিকে প্রথম যে লোকটা এই খবরটা দেয়, সে কিন্তু ওঁকে ওখানে একা ফেলে অফিসের বাকি সকলকে খবর দিতে গিয়েছিল। তখনই কি উনি বোতামটা ডেডবডির হাতে গুঁজে দেন? আবার নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করি। মনে পড়ে, সিটি সেন্টারে ব্লেজারের দোকানের বাচ্চা ছেলোটোর কথা। ও বলেছিল, ‘বুঢ়া আদমি!’ মি. সুরির চুল তো সাদা ব্লিচ করা, তাই ওঁকে দেখে ‘বুঢ়া আদমি’ বলেনি তো? কিন্তু মি. সুরি মার্ডার করলে তাঁর মোটিভ কী? অ্যানি কাজ করছিল মি. সুরি পার্সোনাল কম্পিউটার নিয়ে। ওটার মাধ্যমেই কি মি. সুরি অ্যানিকে দিয়ে কাপাডিয়ার কম্পিউটারের ইউজার আই-ডির পাসওয়ার্ড ব্রেক করে রিসোর্স অ্যাকসেস করে টাকাটা ট্রান্সফার করান? তারপর প্রমাণ লোপাটের জন্য মার্ডার করে অনিকেতের উপর দোষ চাপিয়ে দেন?’ টিনা শুনতে শুনতে বলল, ‘কিন্তু এ তো স্রেফ তোর অনুমান ছিল!’

কিটি হাসল, ‘হ্যাঁ, অনুমানই ছিল। ‘প্রত্যক্ষ প্রমাণ বরং, অবিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত অনুমান একেবারে অমোঘ।’ সত্যসন্ধানী ব্যোমকেশ বক্সি একবার বলেছিলেন এই কথা। আর এই কেসটার ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটে! আমার অনুমান সঠিক কিনা দেখার জন্য ফাঁদ পাতি।

পাশের বিল্ডিংয়ের ফোন থেকে নীলাঞ্জনকে দিয়ে মি. সুরিকে ফোন করিয়ে বলাই যে, নীলাঞ্জন তাঁকে অ্যানিকে নীচে ফেলে দিতে দেখেছে। ও মি. সুরির সঙ্গে একটা ডিল করতে চায়, নইলে খবরটা পুলিশ বা আমাদের কানে তুলে দেবে! নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময় ও দেখা করতে বলে মি. সুরিকে। আর তারপর...’ কিটি কাঁধ ঝাঁকায়।

‘আচ্ছা অ্যানি কি জেনেবুঝে করেছিল কাজটা?’

টিনা প্রশ্ন করে।

‘সে-প্রশ্নের উত্তর জানা এখন আর সম্ভব নয়। তবে আমার ধারণা, মি. সুরি তাকে দিয়ে কাজটা কোনো কৌশলে করিয়ে নিয়েছিলেন। সম্ভবত এ ব্যাপারটাই অ্যানি জানাতে চেয়েছিল অনিকেতকে।’

খাওয়া শেষ করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কিটি বলল, ‘থাক, তোর



নর্থ ক্যালকাটার বিউটি পার্কারে যাওয়া তাহলে হচ্ছে। কাল সারাদিন রেস্ট নেব। তারপর সন্ধ্যাবেলা তোকে নিয়ে যাব ওখানে।’

টিনা বলল, ‘কাল সন্ধ্যায় হবে না।’

কিটি বলল, ‘কেন?’

টিনা একটু ইতস্তত করে বলল, ‘কাল সন্ধ্যায় অনিকেতের সঙ্গে এক জায়গায় যাওয়ার কথা!’

‘মানে?’ ভুরু কপালে তোলে কিটি!

হেসে ফেলল টিনা। তারপর বলল, ‘মানে হল, এথিক্যাল হ্যাকিং!’

---





জন্ম ১৭মে ১৯৭৩, কলকাতায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এম এ।

আজকাল সফর পত্রিকায় ভ্রমণ কাহিনি লিখে লেখালেখির শুরুর। ‘কিশোর ভারতী’তে ‘হারাণখুড়োর মাছ ধরা’ প্রথম প্রকাশিত গল্প।

‘আনন্দমেলা’তে প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘কৃষ্ণমালার গুম্ফা’। আনন্দবাজার, দেশ, সন্দেশ, উনিশ-কুড়ি, সকালবেলা, শুকতারা প্রভৃতি পত্রিকাতে ছোট ও বড়দের জন্য নিয়মিত গল্প-উপন্যাস লিখছেন। একাধিক গ্রন্থেরও প্রণেতা। বেতারে সম্প্রচারিত হয়েছে একাধিক গল্পের নাট্যরূপ। শখ বইপড়া, ভ্রমণ, ফোটোগ্রাফি।

প্রচ্ছদ - নির্মলেন্দু মণ্ডল

ISBN : 978-93-81827-54-3



9 789381 827543 >